স্বরূপ

– সাইয়্যেদা বিনতে রহমান

আমাদের স্কুলের সেকেন্ড স্যার প্রচণ্ড রাগী। বড়আপারা বলতেন, স্যার হাতের কাছে যা পেতেন তা দিয়েই মার শুরু করতেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়নি তখনো। কারণ স্যার শুধু ক্লাস নাইন–টেনে পড়াতেন।

এবার সত্যি সত্যিই স্যারের রূপ দেখার পালা। ইতিমধ্যে তিনটি শ্রেণী পেরিয়ে আমি এখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। রোল প্রথম দিকে হওয়াতে এবং বাবা পরিচিত ব্যক্তিত্ব বলে আমাকে প্রথম থেকেই স্যার চিনতেন। স্বভাবতই স্যারের ব্যাপারে কৌতূহল জাগতো। স্যার শুধু ইংরেজি পড়াতেন। প্রথম যেদিন তার ক্লাস পেলাম সেদিন মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এতো চমৎকার বচনভঙ্গি, সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অত্যন্ত কঠিন বিষয়কে বোধগম্য করে তুলতে পারেন তা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্যারকে ভালোবাসতে শুরু করলাম। এতোদিন ইংরেজি গ্রামারের যে বিষয়গুলো কঠিন এবং দুর্বোধ্য মনে হতো তা আস্তে আস্তে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ক্লাসের প্রতি স্যার যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। প্রতিদিনের পড়া আদায় করে নেয়ার চেষ্টা করতেন। কেউ না পারলে স্যারের খুবই রাগ হতো। রাগে দাত কড়মড় করতেন।

একদিন স্যার আগের দিনের ন্যারেশন বিষয়ে প্রশ্ন করাতে অনেকগুলো মেয়েই জবাব দিতে পারেনি। এদিক–সেদিক তাকিয়ে কোনো লাঠি বা বেত না পেয়ে হাতের কাছে সহজ লভ্য ছাতাটিই লাঠি হিসেবে ব্যবহার করলেন। স্যারের প্রথম স্বরূপ প্রকাশিত হলো। স্যারকে মেয়েরা নাম দিল *ছাতাস্যার।* আমার রাগ হতো। স্যার এতো ভালো পড়ান, এতো সুন্দরভাবে বোঝান, একবারে না বুঝলে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেন। অথচ ছাত্রীরা পড়ে আসে না। দিন দিন স্যারের প্রতি আরো শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। স্যারকে ছাতা বিষয়ে কেউ কিছু বললে রাগ হতো এবং প্রতিবাদ করতাম।

স্যারেরই আন্তরিক সহযোগিতায় আমি ভালো ফলাফল করি। ইউনিভার্সিটির গণ্ডি পেরিয়ে আজ চাকরি করছি। কিন্তু বাবার মতো সেই স্যারের কথা আজো ভুলিনি যার সহযোগিতাতেই ইংরেজিতে অনার্স পড়তে পেরেছি। যাযাদির ছাতা নিয়ে লেখা সংখ্যার জন্য স্যারের কথা আরো মনে করিয়ে দেয়। স্যার আজ আর কাউকে ছাতা দিয়ে মারেন না, এমনকি লাঠি দিয়েও না।

দক্ষিণ মুগদা, ঢাকা থেকে

ছাতা মার্কা বৌ

– সূর্যমুখী

ছোটবোন চয়নকে রাস্তা পার করে স্কুলের গাড়িতে তুলে দেয়া ছিল আমার নিত্যকাজ। সেদিন ভোররাত থেকে প্রচণ্ড বাতাস আর সঙ্গে ঝম ঝম বৃষ্টি। বাতাসের তোড়ে বাগানের কলা গাছ, পেয়ারা গাছ উপড়ে যাবার উপায়। আমি ও মা আল্লাহ আল্লাহ করছি গাছ যেন পড়ে না যায়। সকাল আটটার সময় চয়নের পরীক্ষা। স্কুলে অবশ্যই যেতে হবে।

বাতাসের তোড় আর বৃষ্টির ভেতর দুই বোন দুটো ছাতা মাথায় দিয়ে বের হলাম। স্কুলের গাড়ি এলে গাড়িতে না হয় আমিই স্কুলে পৌছে দিয়ে আসবো। সকাল সাতটার সময় ফাকা রাস্তায় দিয়ে দুই বোন

হাটছি এবং দোকান থেকে বিভিন্ন কথা শুনছি। এতো সকালে বৃষ্টির মধ্যে বের হওয়ার কাজ কি ইত্যাদি। দেখছে স্কুলের ইউনিফর্ম পরনে তবুও বাজে মন্তব্য করা চাই। আল্লাহর মেহেরবানিতে স্কুলের গাড়ি পেয়েছিলাম। তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফেরার পথে হাতে একটা, মাথায় একটা ছাতা নিয়ে বিপাকে পড়লাম। রাস্তা দিয়ে যে হেটে যাচ্ছে সেই বলছে দুটো ছাতা দিয়ে কি করবেন, একটা আমাদের দিন। উফ অসহ্য! একে তো মেয়ে মানুষ তার উপর ছাতা নিয়ে একা হেটে ফিরছি। আরো লজ্জায় পড়লাম যখন আমাদের বাড়ির সামনে একটা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে তার লেবার, মিস্ত্রি সব ঘুম থেকে উঠে বৃষ্টি দেখছে। অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে মাথায় ধরা ছাতাটা গেল উল্টে। আর তার শিকগুলো গেল বেকে এবং বাতাসে এক পা-ও সামনে যেতে পারছি না। বাকা ছাতা কিছুতেই সোজা হচ্ছে না।

মিস্ত্রিরা ডাকছে, আপা, আমাদের কাছে আসেন সব ঠিক করে দিচ্ছি।

খোলা আকাশের নিচে দুই হাতে দুটো ছাতা নিয়ে অসহায়ের মতো দাড়িয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িটা মাত্র একশ ফিট দূরে দেখতে পাচ্ছি।

তাদের মধ্যে ভদ্র মতো একজন আমার অবস্থা বুঝতে পেরে দৌড়ে এসে জোর করে হাত ধরে নিয়ে গেল। তারপর থেকে প্রতিদিন ভোরে রাস্তায় দাড়িয়ে থাকতো। আমাকে *ভোরের পাখি* বলে ডাকতো আর বলতো, ভাগ্যিস, সেদিন তোমার হাতে ছাতা ছিল। সে জন্য প্রেমটা দ্রুত এগোলো।

পুরো একটি বছর ওনার সঙ্গে প্রেম করলাম। এখানে সেখানে ঘুরে প্রতিটা মুহূর্ত আনন্দে ভরিয়ে দিতো। আমাদের বিয়েতে পরিবার থেকে তেমন বাধা দিল না। পাত্র হিসেবে চমৎকার, দেখতে সুন্দর, পেশা ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ে হয়ে গেল দুই পরিবারের সম্মতিতে। বিয়ের পরে ভালোই ছিলাম। প্রথম সন্তান মেয়ে হওয়ার পর সে কিছুটা দুঃখ পেল। দ্বিতীয় সন্তানও মেয়ে হওয়ার পর তার অন্য রূপ বের হলো। মেয়েদের কখনো আদর করে না। অথচ আমার মেয়ে দুটো খুব মেধাবী এবং লক্ষ্মী। তারা বুঝে গেছে সমাজে তাদের দাম জিরোর ঘরে। আমার স্বামীর প্রচুর অর্থ তবু মনে সুখ নেই।

ছাতা এখন গালিতে পরিণত হয়েছে। সারাদিন আমাকে খোটা দেয়। *ছাতা দেখে প্রেমে পড়েছি, ছাতা মার্কা বৌ* পেয়েছি। সন্তানও তাই এসব *ছাতামাতা* আমার ঘাড়ে কেন জুটলো? হায় আল্লাহ! এসব শুনে সহ্য করতে খুব কষ্ট হয়, তবুও মুখ বুজে সহ্য করছি। আজ এগারো বছর। এতো ভালোবেসে যাকে বিয়ে করলাম, এতো স্বপ্ন নিয়ে যার ঘরে এলাম, শুধু পুত্র সন্তান না হওয়ার অপরাধে সব ধুলায় মিশে গেল? খুব অবাক লাগে, আমার স্বামী এতো শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও একটা বংশ প্রদীপের জন্য নিজের ও আমার জীবনটা *ছাতা – ছাতা* করে দিচ্ছে।

ঢাকা থেকে

সেই মেয়েটি

– গালিব

১৯৯৯ সাল। এইচএসসি পরীক্ষা চলছে। সেদিন ছিল সমাজ কল্যাণ ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষা। আমাদের পরীক্ষা ছিল বেলা দুইটায়। কিন্তু দুপুর বারোটা থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি অবশ্য আধঘণ্টা পরেই থেমে যায়। কিন্তু পরে আবার আসতে পারে ভেবে আব্বার ফোল্ডিং ছাতাটা আম্মা সঙ্গে দিয়ে দিল। আমার অপছন্দের কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো বৃষ্টির সময় ছাতা মাথার ওপর ধরে পথ

চলা। আমার মনে হয় বৃষ্টি হলেই সকলের উচিত ছাতা ফেলে দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা। পরীক্ষার কারণে ছাতা সঙ্গে করেই বের হতে হলো। অবশ্য কলেজে পৌছানো পর্যন্ত একবারও বৃষ্টি হয়নি। আমার অপছন্দের কাজটিও করতে হয়নি।

প্রতিবারের মতো এই পরীক্ষাটাও হলো। অর্থাৎ ভালোও না আবার খারাপও না। পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ–পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে আমি, সাজ্জাদ, কালাম ও জুয়েল আলাপ করে এগোচ্ছিলাম। হলে বসেই শুনেছি বাংলাদেশ ওপেনিং পার্টনারশিপে ৭০ রান করেছে। এতোক্ষণে কতো করলো এই জল্পনা–কল্পনা করে আমরা মুদির দোকানের সামনে এসে থামলাম। কালাম দোকানে গেল সিগারেট কিনতে। এর মধ্যে শুরু হলো বৃষ্টি। আমরা দোকানের ঝাপের নিচে গিয়ে দাড়ালাম। আমাদের সঙ্গে আরো কয়েকটি ছেলে এবং একটি মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। সে এসে দাড়ালো। বৃষ্টি বেশ জোরেই শুরু হয়েছে।

আমি অবশ্য ছাতা নিয়ে চলে যেতে পারি। কিন্তু বন্ধুদের জন্য যেতে পারছি না। তাদের কারো কাছেই ছাতা নেই। এর মধ্যে ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন মেয়েটিকে বেশ অশ্লীল একটি কথা বললো। শুনে আমার কান গরম হয়ে গেল। সবার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম কে কথাটি বলেছে। কিছু বুঝতে পারলাম না। সবাই এমন ভাব করতে থাকলো যেন কিছু শোনেনি। মেয়েটির মুখে কেমন একটি অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। আমার খুব বলতে ইচ্ছা করলো মেয়েটিকে, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি। আমি জানি কোনোদিনও তা বলতে পারবো না। মেয়েটিকে আমার ছাতাটি দিয়ে বললাম, তুমি বাসায় চলে যাও। কালকে পরীক্ষার সময় কলেজে ছাতাটি নিয়ে এসো।

মেয়েটি আমার হাত থেকে ছাতাটি নিল। কিছু বলতে চাইলো আমাকে। হয়তো ধন্যবাদ দিতে চায়। কিন্তু কিছু না বলে ছাতাটি ফুটিয়ে চলে গেল।

বন্ধুদের টিপ্পনীর ভয়ে বৃষ্টির মধ্যেই রওনা দিলাম। বাসায় ফিরতেই আম্মা জিজ্ঞাসা করলেন কিরে, তোর ছাতা কই? এভাবে ভিজলি কেমন করে? অনেক কষ্ট করে আম্মাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে ছাতাটি কালাম নিয়ে গেছে। কালকে দিয়ে যাবে।

পরের দিন সেকেন্ড পার্ট পরীক্ষা। এটাই আমাদের শেষ পরীক্ষা। কাজেই পরীক্ষার টেনশনের চেয়ে আনন্দই ছিল বেশি। তার উপর পাকিস্তানকে বাংলাদেশ হারিয়েছে। কলেজে গিয়ে মেয়েটিকে খুজে বের করলাম। কিন্তু মেয়েটি ছাতা আনেনি। বললো, পরীক্ষার টেনশনে একদম ভুলে গেছে।

বললাম, ঠিক আছে পরীক্ষার পরে তুমি গেটের কাছে দাড়িয়ে থেকো। তোমার সঙ্গে তোমাদের বাসায় গিয়ে নিয়ে আসবো।

সে রাজি হলো।

পরীক্ষার পরে হল থেকে বেরিয়েই গেটের কাছে চলে গেলাম। কারণ চাচ্ছিলাম আমার বন্ধুরা কেউ যেন আমাকে মেয়েটির সঙ্গে না দেখে। দেখলাম সে দাড়িয়ে আছে। কলেজ থেকে তাদের বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। মেয়েটি আমাকে তাদের বসার ঘরে বসিয়ে ছাতা আনতে ভেতরে গেল। একটু পরেই ভেতর থেকে বেশ জোরে চিৎকার শুনতে পেলাম। কে যেন কাকে বকছে। মনে হলো মেয়েটিদের বাসায় ঝগড়া লেগেছে। একটি বিব্রতকর অবস্থায় পরলাম এবং একটু পরে বুঝতে পারলাম তার বাবা বকছে। কারণ সে একটি ছেলেকে বাসায় এনেছে। এই অপরাধে মেয়েটিকে বেশ অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করছেন। মেয়েটি শুধু বলছে, বাবা বাইরের ঘরে সে বসে আছে। সব শুনতে পাবে।

এতে করে লোকটার রাগ আরো বেড়ে গেল। আমার চলে আসতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু ছাতাটি তখনো পাইনি। তাই উঠে আসতে পারছি না। মেয়েটির ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। সে তো জানেই তার বাবা এ রকম। তাহলে কেন আমাকে বাসায় আনলো। বাইরে দাড় করিয়ে রেখে ভেতর থেকে ছাতা এনে দিলেই হতো। এর মধ্যে ছাতা হাতে মেয়েটি ঘরে প্রবেশ করলো। কিছু না বলে ছাতাটি নিলাম। তার দিকে তাকিয়ে মনে হলো সে খুব চেষ্টা করছে না কাদতে। কোনো কথা না বলে ছাতা হাতে বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম।

ফরিদপুর থেকে

নিখোজ

– মোহাম্মদ ইমরান

১৯৯৯ সালের ঘটনা। এপ্রিলের ১৫ তারিখে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। আমি ও আমার ফুফাতো ভাই সুবির পরীক্ষার্থী। আমাদের সাহেবরামপুর গ্রামেরই কলেজ থেকে আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি। আমাদের প্রথম পরীক্ষা ছিল ইংরেজি। আমাদের বাড়ি থেকে কলেজে যেতে বিশ মিনিট সময় লাগে।

পরীক্ষার দিন সকালে আমরা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোয়া ন'টার দিকে কলেজে রওনা হই। আকাশে তখন মেঘ ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হওয়ার মতো ছিল না। তাই ছাতা নেয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি। কিছুদূর যেতে না যেতেই প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করলো। একটু পরই বাতাসের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও শুরু হলো।

আমাদের বাড়ি ও কলেজের ঠিক মাঝপথে একটা গার্লস স্কুল আছে। আমরা কোনো রকমে আধভেজা হয়ে দৌড়ে গিয়ে সেই গার্লস স্কুলে আশ্রয় নিলাম। গার্লস স্কুল সেদিন বন্ধ ছিল। স্কুলের বারান্দায় আমরা অসহায়ের মতো ঠায় দাড়িয়ে রইলাম। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই। শিগগির থামারও কোনো লক্ষণ দেখছি না। এদিকে ঘড়ির কাটা যতোই এগোচ্ছে ততোই হার্টবিট বাড়ছে।

কপাল এতোই খারাপ যে, রাস্তাঘাটে কোনো লোকও দেখছি না যাদেরকে একটু সাহায্যের জন্য বলতে পারি। প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ভিজে যাওয়ার ভয়ে দৌড়ে কলেজে যাওয়ার সাহসও পাচ্ছি না। আর দৌড়ে গেলে অন্তত ছয় সাত মিনিট সময় লাগবে।

যে হারে বৃষ্টি নামছিল তাতে কাগজপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পরীক্ষা শুরু হওয়ার মাত্র দশ মিনিটের মতো বাকি আছে। যেতে পারবো কি না সেই ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ দেখি স্কুলের মাঠ দিয়ে দুটি মেয়ে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। তাদের দেখে চিনতে পারলাম। কাছেই তাদের বাড়ি। কলেজে যাওয়ার সময় দেখেছি। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। এবং নামও আমরা জানি না। সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের সমস্যার কথা তাদের জানাবো। তবে কাজ হবে কি না জানি না। আগা পিছু না ভেবেই তাদের ইশারা করে ডাকলাম। এমনিতেই নির্জন জায়গা, তার উপর নির্জনতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বৃষ্টি। তাছাড়া ভেজা কাপড়ে মেয়েরা সাধারণত একটু বেশি লাজুক হয়ে পড়ে। তাই এই

নির্জন বারান্দায় আমাদের ইশারায় তাদের কাছে আসার কথা না। তারপরও কি জানি কি ভেবে আমাদের দিকে তারা কিছুটা অগ্রসর হলো। মিনতি ভরা কণ্ঠে আমাদের সমস্যার কথা তাদের জানালাম। তারা সাহায্য না করলে এই দুর্যোগে যে ভীষণ বিপদে পড়বো সে কথাও বললাম।

তার আগে অবশ্য তাদের নাম জেনে নিয়েছিলাম। উর্মি ও সুফিয়া। দুজনে এ স্কুলেরই ক্লাস নাইনের ছাত্রী। আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পেরে তারা পাশের বাড়ি থেকে একটা ছাতার ব্যবস্থা করে দিলো।

প্রবল বর্ষণে ছাতা হাতে তাদের দুজনকে যেন দেবদূতের মতো মনে হচ্ছিল। অজানা ভালোলাগায় সমস্ত হৃদয় ভরে গিয়েছিল। ধন্যবাদ দেয়ার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাদের কাছ থেকে ছাতা নিয়ে দ্রুত পরীক্ষার হলে পৌছালাম। যদিও আমাদের শরীরের নিম্নাংশ ভেজা থেকে ছাতা রক্ষা করতে পারেনি।

হলে গিয়ে দেখি খাতা দেয়া হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে সবাই মোমের আলোয় পরীক্ষা দিচ্ছে।

ওই দিন পরীক্ষা শেষে ধন্যবাদ সহকারে তাদের ছাতা ফিরিয়ে দিতে গেলাম। তারা সাহায্য না করলে ওই দুঃসময়ে হয়তো আরো অনেক বড় সমস্যা হতে পারতো। তাদের কাছে ওয়াদা করলাম রেজাল্ট ভালো হলে দুজনকে মিষ্টি খাওয়াবো। কিন্তু আমাদের ওয়াদা পুরোপুরি রাখতে পারিনি।

আমাদের গ্রামেরই আওয়ামী সমর্থনপুষ্ট ক্ষমতাসীন চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসী ছোটভাইয়ের ছেলের নজরে পরে সুফিয়া। বখাটে, লম্পট, চাদাবাজ ছেলেটি প্রতিনিয়ত জ্বালাতন করতো। তারপর একদিন সেই লম্পট তার বন্ধু–বান্ধব সহকারে সুফিয়াকে তুলে নিয়ে যায়।

সেই থেকে সুফিয়া নিখোজ। আজো সুফিয়ার কোনো খোজ পাওয়া যায়নি। তার বাবা এখন মেয়ে হারানোর দুঃখে আধপাগল। মামলা করেও কোনো ফল পাননি।

ওই সব হিংস্র পশুদের হাত যে অনেক বড়। তাদের বিচার কখনো হয়নি, হবেও না। সবুজ ছাতা শান্তির প্রতীক। আমাদের নতুন জীবন দান করে, সঠিক পথের সন্ধান দেয়। কিন্তু এই সমাজের হিংস্রতার প্রতীক, নিষ্ঠুরতার প্রতীক লাল ছাতার নিচে যে আমরা সবাই বন্দী। এর নিচে আমরা অসহায়ের মতো কাদি, যন্ত্রণায় ছটফট করি। কিন্তু এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই। শত রোদ বৃষ্টিতেও যে এই লাল ছাতার রঙ এতোটুকু মলিন হয় না।

সুফিয়ার মতো অসহায়ের আর্তনাদে, আমাদের মতো সাধারণের বুকের রক্তে এই ছাতার রঙ যে দিন দিন আরো গাঢ় লাল হচ্ছে। হয়তো আরো হাজারও সুফিয়াকে আত্মাহুতি দিতে হবে এই ছাতার রঙকে অটুট রাখতে। বৃষ্টিভেজা সুফিয়ার নিষ্পাপ মুখখানি আজো আমার চোখে ভাসে। কোথায় আছে সুফিয়া? বেচে আছে কি জঘন্য এই পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে? জানি না। হয়তো জানাও হবে না কোনোদিন।

মিরপুর, পল্লবী থেকে

ওয়ান্ডারফুল

– স্বর্ণালী ভট্টাচার্য প্রীতম

পৃথিবীটা বড়ই বিচিত্র। আর এই বিচিত্র পৃথিবীতে যদি আরো ঘটে থাকে বিচিত্র ঘটনা তাহলে সেটা অন্য রকম হৃদম লাভ করে। কলেজ লাইফ। তার উপর ফার্স্ট ইয়ার। হেভি ফিলিংস।

একদিন বিকেলবেলায় রাস্তায় একা হাটছি আর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছি। ঠিক সেই সময় দুই তিনজন ছেলে আমার পিছু নিল। তাদের দেখেই বুঝতে পেরেছি যে, তারা জাস্ট এনজয় করার জন্য আসছে। কিন্তু তারা শুধু এনজয়ই করেনি, অন্য রকম এক মজার ঘটনার সূত্রপাত করেছিল সেই দিন। আমি যখন রাস্তায় হাটছিলাম তখন আবহাওয়া ছিল একটু গম্ভীর। আকাশ মোটামুটি ঘোলাটে। বৃষ্টি শুরু হবে এমন ভাব। আর এটাকে ধরেই তারা কথা শুরু করলো। তাদের মধ্যে থেকে একটা ছেলে ছিল বেশ হ্যান্ডসাম। ওই হ্যান্ডসাম বয় শুরু করলো।

বললো, এক্সকিউজমি ম্যাডাম। কিছু মনে না করলে আমাদের ছাতাটা আপনি নিতে পারেন।

বললাম, কেন? আপনার ছাতা নেবো কেন?

ছেলেটা বললো, ওই যে দেখছেন না বৃষ্টি শুরু হবে। আপনি ভিজে যাবেন যে।

এটা–সেটা আরো কতো কথা। সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা যে রকম দুষ্টমি করতে পছন্দ করে। ওই হ্যান্ডসাম ছেলেটার সঙ্গে বাকি দুইজন সুর করে বললো, আপনি খুব সুন্দর। বিশেষ করে আপনার ঠোটগুলো ওয়ান্ডারফুল।

আমার তো তাদের দেখেই মেজাজ খারাপ। তারপরে ওই রকম কথা বললে কেমন মেজাজ আরো খারাপ হয়? তাদের সঙ্গে রাফ বিহেভ করিনি। অনেক চেষ্টা করে বুদ্ধি বের করলাম। বললাম, আপনারা অনেক মজার। বিশেষ করে বেশ হেলপফুল টাইপের। আপনারা ছাতা নিতে বললেন। কিন্তু দিলেন না। তার মানে কি এটা শুধু ফর্মালিটি করে বলা?

না। না। কোনো ফর্মালিটি না। আমরা সত্যিই সিনসিয়ারলি আপনাকে ছাতাটা অফার করছি। হ্যান্ডসাম ছেলেটা বললো।

ততোক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আমি সুযোগ বুঝে তাদের ছাতাটা মাথায় নিলাম এবং তাদের সামনে থেকে হন হন করে হেটে চলে এলাম।

তারা অসহায়ের মতো দাড়িয়ে থাকলো। ভাবতেই পারেনি যে, সত্যিই সত্যি তাদের ইয়ার্কি আমি কাজে লাগিয়ে দেব। তারপর আমাকে আর পায় কোথায়?

এদিকে বাসায় এসে হেভি এনজয় করেছি। কিন্তু একা একা। কারণ মা বাবা শুনলে সমস্যা হবে। ছাতাটা এখনো অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। স্মৃতিটা তো আর অকেজো হয়ে পড়েনি! সেই দিনকার কথা মনে পড়ে এখনো হাসি পায়। অনুভব করি হায়রে হ্যান্ডসাম বেচারা! আর দেখা হয়নি।

ঢাকা থেকে

পাংচার

– মানিতা আফ্রেদিতি

ছেলেবেলা থেকেই ছাতা নামে অতি আবশ্যকীয় বস্তুটির প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ ছিল। আব্বার বড় ছাতাটি মেলে মাথার ওপর দিয়ে ঘরময় পায়চারী করতাম এবং বিছানার ওপর ছাতাটি মেলে নিচে বসে পুতুল খেলতে ভালোবাসতাম। ক্লাস থৃতে পড়া অবস্থায় আমাকে যে ছাতাটি আব্বা কিনে দেন তা পেয়ে প্রচণ্ড আনন্দিত হয়েছিলাম। সর্বক্ষণ সঙ্গে রাখতাম এবং ঘুমানোর সময়ও পাশে রেখে ঘুমাতাম। এ ছাতা পাওয়ার পর অস্থির হয়ে উঠি কখন স্কুলে যাবো। কখন সবাই আমার ছাতা দেখে

প্রশংসা করবে, ঈর্ষান্বিত হবে। প্রতিদিন গোসলের সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতাম এবং অতি যত্নের কারণে আমার প্রিয় ছাতাটি অল্পদিন পরেই নষ্ট হয়ে যায়।

হাই স্কুলে পড়া অবস্থায় আম্মা রোজ ছাতা মনে করে দিয়ে দিতেন। প্রখর রোদে মাথার ওপর ছাতা মেলতে বাধ্য হতাম। কিন্তু বৃষ্টি নামতেই বান্ধবীরা সবাই ছাতা গুটিয়ে ব্যাগে রাখতাম এবং অতি আনন্দে হই চই করে বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে বাড়িতে ফিরতেই আম্মা আতঙ্কে অস্থির হয়ে যেতেন। বকুনিও দিতেন প্রচুর। সে বকুনি গায়ে লাগতো না। আনন্দটাই মুখ্য ছিল। অতি বৃষ্টিতে ভেজার কারণে প্রচণ্ড জ্বর হলে আম্মা পরম মমতায় আমার শুশ্রূষা করতেন। এখন আর বৃষ্টিতে ভিজি না। মাথায় বৃষ্টির ফোটা পড়তেই তীব্র মাথা ব্যথা শুরু হয়।

আব্বা যখনই নতুন ছাতা নিয়ে বাইরে যেতেন, ফিরে এলে দেখা যেতো তার হাতে নতুন ছাতার স্থানে রঙচটা পুরনো ছাতা এবং মুখে এক টুকরো অপরাধ মাখা হাসি। বেশির ভাগ সময়ই ওই ঘটনা ঘটতো। কখন কে আব্বার ছাতা চেঞ্জ করে নিয়ে যেতো আব্বা টের পেতেন না।

আমাকে উপাধি দেয়া হয়েছিল পাষাণী। প্রখর রোদে মাথায় ছাতা মেলে স্কুলে যাবার পথে আশপাশ থেকে শোনা যেতো পাষাণীর হাতে ছাতা। এরপর নিজের অজান্তেই কখন যে স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজের গণ্ডি অতিক্রম করে টাঙ্গাইল থেকে ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন ইউনিভার্সিটি ও কলেজের অনার্সে ভর্তি হলাম বুঝতেই পারিনি। এতোটা সময় পেরিয়ে গেছে। বাড়িতে চিঠি লিখেছি। পোস্ট করতে হবে। টিপ টিপ বৃষ্টির মাঝে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে দেড় মাস আগের কেনা থৃ–পার্ট ছাতা।

কলেজ রোডে একটি ট্রাক ইট নামানোর কাজে লেগেছে। রাস্তায় জ্যাম সৃষ্টি হয়েছে। আমি ছাতাটি যথেষ্ট উচু করে একটু একটু করে এগোচ্ছি। সামান্য অসতর্কতায় থেমে যাওয়া রিকশায় আমার ছাতাটিতে প্রচণ্ড বাড়ি লাগে এবং এক পাশটা কেন যেন সামান্য ভারী লাগে। তবু আমি না তাকিয়ে চলতে থাকি। হঠাৎ করেই বুঝতে পারি কে যেন ডাকছে, এই যে ম্যাডাম শুনুন, দাড়ান বলছি।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি একটি চকচকে টাকওয়ালা মাথা এবং টাকের নিচে একজন ভদ্রলোক। গোফ না থাকায় লোকটির গলায় উপরের সমস্ত অংশকে মিষ্টি কুমড়া বলে ভুল হয়। ভদ্রলোকটি পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথা ঢাকতে ঢাকতে রিকশা হতে নেমে আমার কাছে এসে বললেন, দেখে চলতে পারেন না?

লোকটির অবস্থা দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু তার কথা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। লোকটি হাত বাড়িয়ে আমার ছাতার শিকে আটকে থাকা একটা কালো বস্তু খুলে নিলেন এবং ছাতাটি যে ভারী মনে হচ্ছিল সে ভার বোধ আর রইলো না। দেখলাম কালো বস্তুটি হচ্ছে পরচুলা। ঝটপট হাতে পরচুলাটা মাথায় লাগাতেই তার চেহারা পুরোপুরি বদলে গেল।

ম্যাডাম, আমার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিয়েছেন। আস্তে করে বলেই ভদ্রলোকটি তার রিকশায় চেপে বসলেন।

বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল থেকে

উচ্চতা

– আর হীরা

আমি এখন সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। আর ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন আমি ক্লাস সিক্স–এর ছাত্র। একদিন ইংরেজি টিচার আমাদের বেশ কিছু ট্রান্সলেশন করতে দিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল, *আমার পাচটি বই আছে।*

এর উত্তরে একটি মেয়ে, তার নাম সুইটি, সে লিখেছিল, I my have five books.

সেই থেকে যখন তার সঙ্গে দেখা হতো তখন তাকে I my বলতাম। এতে সে খুব রেগে যেতো। এভাবে বেশ কিছুদিন কাটলো। আস্তে আস্তে রাগ থেকে অনুরাগের সৃষ্টি হলো। কিন্তু আমাদের এই মধুর সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। তার একমাত্র কারণ হলো ছাতা।

একদিন স্কুল ছুটি হওয়া মাত্রই বৃষ্টি শুরু হলো। যখন বৃষ্টি শুরু হলো তখন আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। কারণ আমি ও সুইটি একই ছাতার নিচে বাড়ি যাবো। আমাদের বাড়ি রেখে তাদের বাড়ি যেতে হয়। গ্রামের পথ। একটু বৃষ্টি হলেই হাটু সমান কাদা হয়। তাই আমি ও সুইটি জুতা জোড়া হাতে নিয়ে একই ছাতার নিচে দিয়ে যাচ্ছিলাম।

সুইটি শুধু আমার দিকে তাকাচ্ছিল। সে আবিষ্কার করলো তার চেয়ে আমি খাটো। সে এতোদিন বুঝতে পারেনি। কারণ আমি উচু হিলওয়ালা জুতা পরতাম। ছাতার নিচে যাওয়ার পর থেকে সুইটি আস্তে করে আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল।

যদি আমি সেদিন তার ছাতার নিচে না যেতাম তাহলে মনে হয় এমনটা হতো না। ছাতার কারণেই আমার প্রথম ভালোবাসা হারিয়েছি।

সুলতানপুর, সাতক্ষীরা থেকে

গোলাপ

–– অনামিকা

২০০০ সালের ২৮ অক্টোবর। আমার জন্মদিন। কিন্তু মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। কলেজে ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। আজ অর্থনীতি পরীক্ষা। তার ওপর সকাল থেকে একটানা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। চারদিকে কেমন যেন মন খারাপ করা পরিবেশ। ভেবেছিলাম পরীক্ষা শেষে আমার প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে রিকশা করে ঘুরবো তা আর হলো না বোধহয়।

যাই হোক। বেলা দুটায় পরীক্ষা। তাই দেড়টার দিকে ছাতা নিয়ে বাসা থেকে বের হলাম। এখানেও বিপত্তি। একটা রিকশাও নেই। কি আর করা! হেটেই চললাম কলেজে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি আমার প্রিয় মানুষ ছাতা নিয়ে আমারই প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে। আমি কাছে আসতেই বললো, হ্যাপি রেইনি ডে।

হেসে ফেললাম তার বলার ধরণ দেখে। তারপর সে কলেজে পৌছে দিয়ে পরীক্ষা শেষ হলে আসবে বলে চলে গেল। যাওয়ার সময় আমার ছাতাটাও নিয়ে গেল। পরীক্ষা শেষ করে বাইরে এসে দেখি আমার ছাতা নিয়েই সে দাড়িয়ে আছে। হাতে আর কিছুই নেই। ভেতরে ভেতরে খুব মন খারাপ করলাম। কারণ আমার প্রতিটি জন্মদিনেই সে অদ্ভুত কিছু এনে আমাকে অবাক করে দেয়। ভেবেছিলাম আজো কিছু থাকবে। রিকশা না থাকায় এক ছাতার নিচে আমরা পাশাপাশি হাত ধরে হাটতে লাগলাম। হঠাৎ একটি রিকশা পেয়ে কিছুক্ষণ ঘুরবো বলে উঠে পড়লাম।

রিকশায় উঠেই কিছুক্ষণ পর সে বললো, ছাতাটা উপরের দিকে তাকিয়ে খোলো।

ছাতাটা খুলতেই একটা টকটকে লাল গোলাপ এসে আমার কোলের ওপর পড়লো। উপরে তাকিয়ে দেখি ছাতার শিকের গায়ে আটকানো আরো অনেকগুলো গোলাপ। অবাক হয়ে একবার তার দিকে আরেকবার ফুলের দিকে তাকাতে লাগলাম।

সে ভুবন ভোলানো একটা হাসি দিয়ে বললো, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। কলেজের সামনে গোলাপ নিয়ে দাড়ালে এতোক্ষণে তোমার বন্ধুদের হাসির বিষয় হয়ে যেতাম। তাই এই ব্যবস্থা। ভাগ্যিস ছাতাটা ছিল!

খুব ধীরে ধীরে বললাম, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ। আই লাভ ইউ।

সে হেসে বললো, হয়নি, বলো থ্যাংক ইউ ছাতা। আই লাভ ইউ।

হেসে অপলক তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর মনে মনে বললাম, থ্যাংক ইউ ছাতা, থ্যাংকস মাই লাভ।

ময়মনসিংহ থেকে

পরোপকার

– মোহাম্মদ কামরুল হাসান কাজল

আমরা যেখানটায় থাকতাম, কয়েকটা কলেজ এবং স্কুলের সমন্বয়ে বেশ একটা সুন্দর পরিবেশ। কলেজে যেতে এবং আসতে কয়েকটা চড়াই উৎরাই পার হতে হতো। এমনি এক চড়াইয়ে বা কখনো উৎরাইয়ে একটি মেয়েকে দেখতাম নাম জানা ছিল না। সাধারণ একটি মুখ। কি অপূর্ব মায়া! দেখাটা বোধহয় খুব বেশি হয়ে যেতো। তাই ড্রেস পরা মেয়েটিও একদিন আমাকে দেখলো। বোধহয় খাস্তগীর স্কুলে পড়ে। ভাবলাম, সে ভাবলো ছেলেটি কে? দুই তিন দিনে ভ্রূকুটি একটি মুচকি হাসিতে পরিণত হলো। হাসিটাও কি মিষ্টি! কিছু বলবো খুজে পাই না। তাই বলা হয় না। চোখের দেখা, মৃদু হাসি, যাওয়ায় বা আসার এতেই সীমাবদ্ধ থাকতো, যদি না সেই বৃষ্টি ঝরা রাতটা আসতো।

বরাবরের মতো বিকেলের আড্ডায় গিয়েছিলাম। তখন বর্ষাকাল, মেঘের ঘনঘটা দেখে ছাতাটা সঙ্গেই ছিল। ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দশটা। মাঝারি থেকে একটু ভারী রকমের বৃষ্টি পড়ছিল। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠছিলাম একা। বৃষ্টির রিমঝিম, গুনগুনিয়ে গান, সব মিলিয়ে বেশ রোমান্টিক লাগছিল। মাঝে মাঝে দ্রুতগামী গাড়ি পানি ছিটিয়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি বেবিট্যাকসির ঘো ঘো শব্দে ফিরে তাকালাম। নিয়ন বাতির ঝাপসা আলোয় দেখলাম ঢালের চুড়া পাওয়ার বেশ আগেই একটা বেবি তার দম ফেল করেছে। চোখ ফিরিয়ে নেবো। হঠাৎ মনে হলো যদি পেছন দিকে গড়িয়ে যায়? দ্রুত হাটলাম, ইঞ্জিনের ঘো ঘো-র সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেবির পেছনে ধাক্কা দিলাম। এক ইঞ্চিও নড়লো না। বেবি চালক বেবি থেকে নেমে যাত্রীদের জানালেন, গাড়ি আর যাবে না। যাহোক, সামনের দিকে এগিয়ে বেবির ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম, এখানকার কোয়ার্টারে থাকা চট্টগ্রাম কলেজের একজন স্যার। সঙ্গে আরেকজন কে যেন। সালাম দিয়ে ছাতা এগিয়ে বললাম, চলুন স্যার, পৌছে দেই।

স্যার তখন বললেন, এক ছাতায় তিনজন?

বৃষ্টির পানিতে নিয়নের আলো ঝাপসা হয়ে গেছে। সেই ঝাপসা আলোয় ট্যাকসির কোণে বসে থাকা দ্বিতীয় যাত্রীকে দেখে হৃদপিণ্ডটা এক লাফে গলার কাছে উঠে এলো, আরে, এ-তো-সে।

বললাম, তিনজন কোথায়, আপনারা দুজন যান। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। তার মেয়েকে স্যার নিয়ে নেমে এলেন। এছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। বৃষ্টি থামারও কোনো লক্ষণ নেই।

তুমি যে ভিজে যাচ্ছো? বললেন স্যার।

কিছু হবে না।

তারা দুইজন ছাতার নিচে। আমি পেছনে ভিজে চললাম। অজানা এক সুখের শিহরণ আমার বুকের ভেতর খেলা করে চললো। সে তার ওড়নাটা গুছিয়ে আড়চোখে আমার দিকে তাকালো। তার চোখের মায়া সেই কল্পনাতেও আমার চোখে পড়লো। তার সঙ্গে কথা বলার কতো চিন্তাই না করেছি। ভাবতে ভাবতে, ভিজে এগোলাম। তাদের বাসায় চলে আসার পর ছাতা ফেরত দিয়ে স্যার আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। ভদ্রতা করে ভেতরে একটু বসে যেতেও বললেন। সে একটি কথাও বললো না। সঙ্গে সঙ্গেই বাসার ভেতরে চলে গেল।

স্যার, আমি পুরো ভিজে গিয়েছি, বাসায় যাই।

স্যার কিছু বলার আগেই ঘুরে রওনা দেবো এমন সময় সে বের হয়ে এলো। হাতে একটা তোয়ালে।

মাথাটা মুছে যান, অসুখ করবে যে!

তার চোখে তাকিয়ে না করতে পারলাম না। তোয়ালে ফিরিয়ে দেয়ার সময় চোখে চোখ পড়লো। স্পর্শ হলো তার হাত। চমকে উঠলাম। তার ভাবলেশহীন ছোয়ায় মুখে বললো, ধন্যবাদ।

কিন্তু তার চোখ বললো অনেক কথাই। সেই কথা বোঝার মতো সাহস আমার ছিল না। তাই আমার কিছুই বলা হলো না। মনে মনে শুধু ছাতাকে ধন্যবাদ জানালাম যা না হলে এ মিশন সাকসেসফুল হতো না।

বাসায় ফিরে নানানজনের নানান প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম।

ছাতা নিয়ে ভিজলে মানে? মাথা তো শুকনোই, ট্রাকের পানি ছেটানো নয় তো? নাকি কোথাও পড়ে গিয়ে...?

উত্তরে মৃদু হেসে বললাম, পরোপকার।

কোনাবাড়ি, গাজীপুর থেকে

নিমন্ত্রণ

– মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মোল্লা

১৯৭৫ সাল। তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। বরাবরই নিয়মিত ক্লাস করতাম। আর কেমিস্ট্রি ক্লাস মিস করার কথাতো চিন্তাই করতাম না। কারণ কেমিস্ট্রির স্যার ছিলেন ভীষণ বদমেজাজি। ক্লাস মিস করা পছন্দ করতেন না। এবং প্র্যাকটিকাল ক্লাস কেউ মিস করলে তুলকালামকাণ্ড করে বসতেন। তাকে সবাই ভয় পেতাম। তাই যতো সমস্যাই থাকতো না কেন, তার ক্লাসে আমরা উপস্থিত থাকতাম।

সমুদ্রে নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টি হচ্ছে। থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে বারোটার সময় প্র্যাকটিকাল ক্লাস। ছাতা ছিল দুটি। একটি বাবা এবং অন্যটি ভাইয়া নিয়ে সকালেই বেরিয়েছেন। মেইন রোডে গেলে রিকশা পাওয়া যায়। কিন্তু বাসা থেকে মেইন রোড যেতে পাচ ছয় মিনিট সময় লাগে। এই পথ ছাতা ছাড়া গেলে ভিজে রসগোল্লা হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এগারোটা বেজে যাচ্ছে। কমপক্ষে আধঘণ্টা আগে বের হতে হবে। বৃষ্টি থামছে না দেখে টেনশন বাড়ছে।

মা বললেন আসাদভাইদের বাসায় ছাতার খোজ নিতে।

আসাদভাই হচ্ছেন আমাদের প্রতিবেশী। ইটালি থাকেন। আট নয় বছর ইটালি থাকার পর এখানে বাড়ি করেন। এরপর বিয়ে। সুন্দর বাড়ি করেছেন। তার চেয়ে বেশি সুন্দর তার স্ত্রী। বিয়ের তিন মাস পর আবার আসাদভাই ইটালি চলে যান। বাড়িতে থাকেন স্ত্রী আর বৃদ্ধ মা। আসাদভাই–এর স্ত্রী মাঝে মধ্যে আমাদের বাসায় আসতেন। তবে তার সঙ্গে কখনো আমার কথা হয়নি। আমার আত্মবিশ্বাস ন্যূনতম পর্যায়ে, আর মেয়েদের সামনে গেলে সেটা আরো কমে আসে।

ছাতার জন্য রওনা হলাম বৃষ্টিতে ভিজে। বিশাল দরজার সামনে দাড়িয়ে কলিংবেল টিপছি, দুইবার, তিনবার কোনো সারা শব্দ নেই। দরজায় একটা হোল ছিল। তাতে ঢাকনা দেয়া। ঢাকনাটা সরাতেই দেখি আসাদভাইয়ের স্ত্রী বৃষ্টিতে ভিজছেন। পিঠে কাপড় নেই। বৃষ্টি ভেজা কাপড় শরীরে লেপ্টে আছে। ব্লাউজ দিয়ে শরীর ডলছেন। আমি হোল থেকে চোখ সরালাম। ভাবলাম কেউ দেখে ফেললে মহাকেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ইতস্তত করে নক করলাম।

গেট খুলতেই তিনি বললেন, আরে তুমি! কি ব্যাপার। এসো ভেতরে এসো?

আমি ভীত পায়ে ভেতরে ঢুকলাম।

তিনি গেট লাগিয়ে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ছাতা আছে কি না।

ছাতা দিয়ে কি হবে?

কলেজে যাবো।

তিনি বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, এই বৃষ্টির ভেতরে কলেজে। বোকা কোথাকার। এর ভেতর ছাত্ররা তো দূরে থাক, টিচাররাও আসবে না। তার চেয়ে বরং এসো বৃষ্টিতে ভিজি। তারপর ভুনা খিচুরি খাওয়াবো তোমাকে। অবশ্য মন চাইলে অন্যসবও হবে।

কথা শুনেই আমার ভীষণ লজ্জা লাগলো যেন এখান থেকে পালাতে পারলেই বাচি।

আচ্ছা তুমি সব সময় মাথা নিচু করে রাখো কেন? আমি কি দেখতে অসুন্দর? এই, আমার দিকে তাকাও বলছি।

দ্রুত একবার তার মুখের দিকে তাকালাম। দেখি তার কোমরের উপরের অংশে আব্রু নেই। এমনিতেই আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মাথা নুয়ে মনে হয় পায়ের নিচে চলে যাচ্ছিল। দেরি করলে মা চিন্তা করবে বলেই হাটা শুরু করলাম।

তিনি পেছন থেকে বললেন, গর্দভ কোথাকার। মায়ের আচলের নিচেই থাকো গিয়ে।

গেট থেকে বের হয়ে এক দৌড়ে বাসায়। এরপর আর কখনো ওই বাসায় যাইনি। তিনি আগের মতোই মাঝে মধ্যে আসতেন। এরপরও দুই একবার মায়ের কাছে আসার নিমন্ত্রণ দিয়ে যেতেন। কিংবা কোনো আয়োজন হলেই আমাকে যেতে বলতেন এবং তাও মায়ের কাছে বলে যেতেন। কিন্তু যেতাম না।

কিছুদিন পরই আসাদভাই তার স্ত্রীকেও ইটালি নিয়ে যান। অনেক দিন পর আজ মনে হয় সেদিনের সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে তাকে এবং নিজেকে বঞ্চিত করেছিলাম একটি মধুর মুহূর্ত থেকে।

টঙ্গী, গাজীপুর থেকে

প্রেস্টিজ

– মোহাম্মদ ওমর ফারুক দোলা

কার্নিজকে পড়াতে যেতাম বিকেলে। পড়ানো শেষে পাবলিক লাইব্রেরিতে কিছুক্ষণ পত্রপত্রিকা পড়ে রুমে ফিরতাম। এই ছিল সপ্তাহের চার দিনের রুটিন।

আজ ব্যত্যয় ঘটলো। পড়ানোর মাঝেই শুরু হলো বৃষ্টি। প্রথমে গুড়ি গুড়ি। তারপর মুষলধারে।

পড়ানো শেষ। বৃষ্টি পুরোপুরি থামার কোনো লক্ষণ নেই। একটু থামে আবার শুরু হয়। নিজের প্রতি খুব রাগ হলো। রুম থেকে বের হবার সময়ে পরিষ্কার আকাশ দেখে প্রকৃতিকে এতোটা বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি।

মাগরিবের আজান পড়লো। নাহ! আর বসে থাকা যায় না। পাবলিক লাইব্রেরিতে যাবার আশায় গুড়ে বালি। আপাতত রুমে ফেরার কথাই ভাবছি। একটা রিকশা ডেকে চলে যাওয়া যাবে।

ব্যালকনিতে এসে আমি থ। সারা রাস্তায় পানি জমে গেছে। দুই একজন হাটাচলা করছে হাটুপানি মাড়িয়ে। কোনো রিকশাও নেই। কার্নিজকে বলে তাদের কাজের ছেলেটাকে একটা রিকশা ডেকে দেয়ার জন্য মেইন রোডে পাঠালাম। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। এতো পানি ভেঙে কোনো রিকশাই আসতে রাজি হয়নি। কি আর করা! জুতা খুলতে খুলতে কার্নিজকে বললাম, একটা ছাতা নিয়ে এসো। এখানে আর বসে থেকে লাভ নেই। পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এলে আরো অসুবিধা হতে পারে।

কার্নিজ আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখতে বললো।

আমার পড়াশোনার দোহাই দিয়ে আর থাকা যাবে না বলে জানালাম।

সে ছাতা নিয়ে এলো। মাথা নিচু করে বললো, স্যার, আমার ছাতাটা নিয়ে আব্বু, আর আপুরটা নিয়ে মামা বের হয়েছেন। এখন শুধু আম্মুর এ ছাতাটাই বাসায় আছে।

তাতে কি হয়েছে! তুমি লজ্জা পাচ্ছো কেন?

এতো বড় ছাতা কেউ কি আজকাল ইউজ করে?

মাঝে মাঝে বৃষ্টি যেভাবে ভারী হয় সে অবস্থায় বড় ছাতাই তো ভালো। তাই না?

জি স্যার।

গুড! বলেই ছাতাটা মেললাম। এবার বুঝতে পারছি সে কেন লজ্জা পাচ্ছিল। ওটা পরিবার পরিকল্পনার স্বাস্থ্যকর্মীদের ছাতা। যাতে লেখা, *সেবা নিন, ভালো থাকুন।* এসব ছাতা সবাই ব্যবহার করে না বলেই হয়তো এটা দিতে কার্নিজ সঙ্কোচ বোধ করছিল।

হাটু পানি ভেঙে মূল রাস্তায় এসে রিকশা পেলাম।

পরদিন কার্নিজকে পড়ানো শেষে চলে আসবো এমন সময় স্মিতহাস্যে তার মা রুমে ঢুকলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বাবা, *সবুজ ছাতা* মাথায় দিয়ে চলাচল করেছো। মান সম্মান খসে পড়েনি তো?

আমি কিছুই না বুঝে ওনার মুখের দিকে হা করে চেয়ে রইলাম।

তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, আমার দুই সন্তান আর আদরের ছোটভাই। তারা বৃষ্টিতে ভিজে বা রোদে পুড়ে জ্বর বাধিয়ে ফেললেও এ ছাতায় হাত দেবে না। তাদের নাকি প্রেস্টিজ কমে হয়ে যায়। তোমার প্রেস্টিজ তো দেখছি খুব শক্ত!

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে ফেললাম।

কার্নিজও মাথা নিচু করে মিটিমিটি হাসছিল।

ময়মনসিংহ থেকে

কুসংস্কার

– শ. শ. রহমান

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি কাউকে রুমাল উপহার দিলে নাকি তার সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়। এ কথার ভিত্তিতেই আমার এক বন্ধুকে তার প্রেয়সী ভালোবাসার উপহার স্বরূপ রুমাল দিলে সে রুমালটি ১ টাকা ২৫ পয়সা দিয়ে কিনে নেয় যাতে তাদেরকে পরবর্তী কালে ঝগড়া নামে কোনো ভাইরাস আক্রান্ত না করে।

আমি মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে কলম উপহার দিই। কিন্তু এক মেয়ে বন্ধু উপহার হিসেবে কলম নিতে অপারগতা প্রকাশ করে বলে, কলম নিয়ে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাই না। যেসব বন্ধু আমার দেয়া কলম নিয়েছিল তাদের সঙ্গে পরবর্তী কালে আমার সেই ঘনিষ্ঠতা আর থাকেনি।

কিছুদিন আগে আমার ২৪তম জন্মদিন উপলক্ষে আমার এক ঘনিষ্ঠ মেয়ে বন্ধু, শুধু বন্ধু বললে ভুল হবে, আমি আসলে তাকে নিয়ে অন্য রকম ভাবতে শুরু করেছিলাম। ভাবতে মানে তার জীবনে রোমিও হিসেবে আবির্ভূত হতে চেয়েছিলাম। আমার সেই কল্পনার জুলিয়েট আমাকে একটা কালো ছাতা উপহার হিসেবে দিয়ে বললো, আমার এই সামান্য উপহার তুমি গ্রহণ করো।

তার এ রকম অদ্ভুত উপহার পেয়ে বিস্মিত হই এবং মনে মনে ভাবি, এ যে দেখি একুশ শতকের মহিলা রোবট যার সব কিছু থেকেও কি যেন নেই। বুঝতে পারিনি সেই মহিলা রোবটের উপহার আমাকে এতোটা কষ্ট দেবে। তার সেই উপহার প্রাপ্তির পর থেকে সম্পর্ক এতোটাই খারাপ হয়েছে যে, তাকে দর্শন করতে হবে বলে ক্যাম্পাসে যাওয়া বন্ধ করেছি।

আমি জানি না সে জানতো কি না ছাতা উপহার দিলে ভালোবাসা ভাইরাস তাড়ানো যায়। তবে আমি জেনেছি ছাতা উপহার দেয়া মানে ভালোবাসা নষ্ট করা।

দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা থেকে

ইতুর মা

– জাফর বায়েজীদ

সাত বছর আগের কথা। আমি তখন রাজশাহীতে। ইংরেজিতে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি দুটো টিউশনিও চালাতাম। এর মধ্যে একটি ছিল দুইজন ডিগ্রি পড়ুয়া ছাত্রীর ব্যাচ। বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে আসতাম। সেই পড়ানোর প্রথম দিন থেকেই তাদের একজনকে ভালো লাগতো।

সবচেয়ে তার কণ্ঠ আর চোখ আমাকে তীব্র কাছে টানতো। সত্যিই এ দুটো জিনিস ছিল আমার কাছে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এভাবেই কখন যেন আমার অজান্তেই তাকে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলেছি জানি না।

তখন জুনের মাঝামাঝি। নিয়ম মাফিকই পড়াতে গেছি একদিন। মিনিট পনেরো পড়ানোর মাথায় চারদিকে অন্ধকারে ছেয়ে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বৃষ্টি শুরু হলো। রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টির শব্দের মাঝেই এক সময় পড়ানো শেষ হলো। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো তখনি। আমি এখন রুমে ফিরবো কি করে?

বাড়িতে ছাতা আছে কি না জিজ্ঞাসা করার আগেই সে আমাকে বললো, এতো বৃষ্টিতে যাবেন কি করে? তার চেয়ে বসুন, গল্প করি।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই ভেবে, সে কি করে বুঝলো যে আমি এটাই চাচ্ছিলাম। এ কথা সে কথা এই করে কখন যে পুরো একটা ঘণ্টা পার হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। অথচ তখনো মনে প্রাণে চাচ্ছিলাম বাড়িতে যেন ছাতা না থাকে আজকের এ বৃষ্টি যেন আর কোনোদিন না থামে। না হোক আমার বাড়ি ফেরা। যাকে ভালোবাসি প্রচণ্ড সে তো আমার সঙ্গে আছে।

বৃষ্টি তখনো থামেনি। এক সময় উপায় না দেখে জিজ্ঞাসা করলাম বাড়িতে ছাতা আছে কি না।

আমাকে নিরাশ করে দিয়ে সে ছাতা নিয়ে হাজির।

আমি তখন সত্যিই হতবাক। বাড়িতে যদি ছাতা থেকেই থাকে তাহলে এতোক্ষণ আনেনি কেন সে? তখনি বুঝেছিলাম সব।

কয়েকদিনের জন্য মনটা বিষণ্ন হলেও পরে জানতে পেরেছি সে আমাকে পছন্দ করে ভীষণভাবে। অবশ্য সেদিন ছাতার জন্য খানিক নিরাশ হলেও আজ আর আমি নিরাশ নই। সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ এখন একান্তই আমার। কারণ সে আমার ছোট্ট সোনামণি ইতুর মা।

রংপুর থেকে

পীড়া

– আলতাফ হোসেন লাভলু

ছাতা নিয়ে ছোটবেলার একটি ঘটনা। বাংলাদেশে অধিকাংশ শিশুরা যে সময়ে ঝরে যায়, বঞ্চিত হয় লেখাপড়া সেই বয়সে আমার সৌভাগ্য, দায়িত্বশীল পিতা যথাসময়েই একটি বই এনে আমার লেখাপড়ার হাতে খড়ি দেন। নিয়মিত পড়াতেন। A–তে Ant (অ্যান্ট) মানে পিপড়া, B–তে Book (বুক) মানে বই, C–তে Cat (ক্যাট) মানে বিড়াল, এমনি U–তে Umbrella (আমব্রেলা) মানে ছাতা। এভাবে নিয়নের আলোয় মন দিয়ে পড়তাম। অপরিচিত Umbrella শব্দটি পেয়ে আমার নানান প্রশ্ন? আব্বু, ছাতা কি? সেটা দিয়ে কি করে? নতুনকে আবিষ্কারের এমন হাজারো প্রশ্ন?

একটু বিব্রত হয়ে বাবা বলেন, Umbrella ইংরেজি শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ ছাতা। আর ছাতা হলো রোদ–বৃষ্টি থেকে নিজেকে সুরক্ষা করে। এটা দৈনন্দিন জীবনে কর্মব্যস্ত মানুষের নিত্যসঙ্গী। তুমি বড় হয়ে যখন স্কুলে যাবে তখন কিনে দেবো।

সত্যি দেবে?

হ্যা দেবো। এখন পড়ো।

সময়ের সঙ্গে এক–দুই করে ক্লাস ফাইভে উঠি। রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে স্কুলে যাই। টিউবওয়েলের পানিতে পা ধুয়ে ক্লাস করি। তবুও বাবা ছাতা কিনে দেননি। আজ নয় পরশু, এভাবে মাস, বছর পেরিয়ে যায়। অগত্যা বৃষ্টি নামলে কচুর পাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি ফিরি। অথচ আমার বন্ধু মুন্নার কি সুন্দর ফোল্ডিং ছাতা। অনেক সময় ওর ছাতায় শেয়ার করতে বলে। মাঝে মধ্যে যাই। এ জন্য বন্ধুকে বকা খেতে হয় ওর সৎমার। এ অভিমানে একদিন অপমান আর রাগে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়ি এসেই বায়না ধরি, আমাকেও কিনে দিতে হবে ফোল্ডিং একটি ছাতা। না হলে স্কুলে যাবো না।
বাবা সান্ত্বনা দেন। কয়টা দিন সবুর করো। আগামী মাসে কিনে দেবো।
অবশ্য ছাতা কেনার ব্যাপারে বাবার আন্তরিকতা ও চেষ্টার ক্রটি ছিল না। অর্থাভাবই ছিল এর জন্য দায়ী। তিনি ছিলেন সৎ মানুষ তৈরির কারিগর। তাই ফুডের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজ ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠা করেন স্কুল। শিক্ষকতাকে ব্রত করেন এই স্বল্প আয়ের সংসারে আমরা অনেকগুলো ভাইবোন। লেখাপড়ার খরচ যোগাতে তার *নুন আনতে পানতা ফুরায়*। সেখানে ছাতা কেনার বাড়তি টাকা জোগানো আরো কষ্টের। অনেকটা না বুঝেই আবদার করতাম একটি ছাতার! শুধু শখের বশেই নয়, আমার জন্য তা ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয়। বর্ষাকালে আকাশ জুড়ে মেঘ করে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামলেই ছাতার প্রয়োজনীয়তা বেশি উপলব্ধি হয়। তারপর ঠাণ্ডা জ্বরে আমি ভোগার পর ছাতা কেনার প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্র অনুভব করেন বাবা। কিন্তু বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কিনতে ব্যর্থ হন। এই লজ্জা তাকে বিদ্ধ করে। এবার শেষবারের মতো তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সামনের মাসে কিনে দেবো। ইনশাআল্লাহ।
২৬ তারিখ সোমবার। বাবা পরীক্ষা হলের একবেলা ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরেন। বিকেলে বাজারে যান। মা বললেন, আকাশে মেঘ করেছে, সকাল সকাল ফিরো।
বাবা বাজার সেরে বাড়িতে এলে আমরা সবাই দৌড়ে যেতাম খাজার আশায়। আজো তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু বাড়ির বড়দেরও জমায়েত হতে বললেন আজ। দক্ষিণের বারান্দায় মহাখুশিতে সবার হাতে কিছু না কিছু তুলে দিলেন বাবা। এবার আমাকে বললেন, চোখ বন্ধ করো।
মেলেই দেখি চমৎকার একটি ছাতা আমার হাতে। আমার সে কি আনন্দ। হুর হুর নাচতে লাগলাম যেন রাজ্য জয় করেছি। আমার নির্মল আনন্দে বাবাও তৃপ্তির হাসি দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। মোড়ানো ছাতাটি বাবা ফুটিয়ে দিলেন। এমন সময় বাইরে বৃষ্টির ফোটা পড়ছে। হঠাৎ মুষলধারে শুরু হলো। ঝমঝম বৃষ্টি। ভেজার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বাধা উপেক্ষা করেই উঠানে নেমে পড়লাম। বাবা দৌড়ে আমাকে ধরতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে পরে ইটের সঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত পান মাথায়। শোকের ছায়া নেমে এলো বাড়িতে। চারদিকে বাবাকে ঘিরে কান্নার রোল। ভয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়েই আত্মীয়রা বাবার সৎকার সারলেন।
আনন্দ ও কষ্টের এ মুহূর্তটি জীবনেও ভোলার নয়। আমার এ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি ছাতা কালের নীরব সাক্ষী হয়ে। ছোটবেলার সেই স্মৃতি আজ নতুন করে পীড়া দিচ্ছে লিখতে বসে। এখন মধ্য বয়সে এসে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। আমার জন্যই হয়তো বাবার এ অপমৃত্যু। আমি যদি ওভাবে ছাতা না চাইতাম, তারুণ্যের উচ্ছ্বলতায় সেদিন অবাধ্য না হতাম, হয়তো বাবার এ দুর্ঘটনা ঘটতো না। এই আত্মহনন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বাবার দেয়া আমার শেষ সম্বল এ ছাতাটি ব্যবহার না করে সযত্নে রেখে দিয়েছি। মনটা খারাপ হলেই ছাতাটাকে বুকে আগলে রাখি। অনুভব করি বাবার স্পর্শ।

সিরাজগঞ্জ থেকে

জয়তু

– মোতাহার হোসাইন

কাতারের এই প্রচণ্ড গরমের দেশে এমনিতেই রোদে বের হই না। সার্বক্ষণিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রুমেই অবস্থান করি। জুমার নামাজে হেটে যেতে হয় প্রায় আট নয়শ গজ দূরের মসজিদে। তীব্র রোদ থেকে বাচার জন্য এখনো আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে থাকে ছোট্ট একটি ছাতা। এখানকার লোকজনও তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। কারণ এখানে ছাতার ব্যবহার নেই বললেই চলে।

দোহা–কাতার থেকে

ছায়া

– রেহানা

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়। অসময়েই বর্ষাকালের মতো দুই তিন দিন টানা বর্ষণ। কর্মস্থলে যাবার সময় সেদিন ছাতাটা নেয়া হয়নি। বাসে ওঠার আগেই তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হলো। রংপুর শাপলা চত্বর থেকে বাসে উঠেছি। তিস্তা ব্যারাজ–এর কাছাকাছি এসে লক্ষ্য করলাম নদীর পাড়ের দোকানগুলো উল্টে পড়ছে। প্রচণ্ড বাতাস আর তুমুল বৃষ্টি। আকাশেও কালো মেঘের আধিপত্য। চারদিকে ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে।

আমার গন্তব্য আপাতত তিস্তা বাসস্ট্যান্ড। তিস্তায় এসে বাস থেকে নামলাম। বুঝতে পারছি না কি করবো। আশপাশের দোকানের ঝাপগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। একটা হোটেলের ভেতর থেকে অনেকগুলো লোক আমাকে দেখে হই হই, রই রই করে উঠলো। দুই একজন শিষ দিতে লাগলো। লোকগুলো এতো নোংরা মানসিকতার। আমার মনটা খুব খারাপ হলো। অবশ্য এই মুহূর্তটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। দেখলাম একটা ছেলে ছাতা হাতে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। আমাকে ছাতার নিচে আশ্রয় দিয়ে নিজেকে ভিজিয়ে মিনিবাসে উঠিয়ে দিল। তারপর তোয়ালে হাতে দিয়ে বললো, মাথাটা মুছে নিন।

ছেলেটিও একই বাসে রংপুর থেকে এসেছে। আমাদের দুজনার গন্তব্য আলাদা। তবে একই পথে। পাশাপাশি সিটে আমরা বসলাম।

ছেলেটি বললো, এখানকার লোকজন আপনাকে ভিজতে দেখে অশালীন মন্তব্য করছিল। তাই এগিয়ে এলাম আপনার দিকে।

আমি তার দিকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাকালাম। খুব মায়াবী চেহারা। কিন্তু চোখে মুখে অসহায়ত্বের ছাপ।

আলাপচারিতায় জানতে পারলাম তার নাম জয়। পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে অনেকটা বিমর্ষ হয়ে গেল। তার বাবার ইচ্ছা ছিল তাকে ডাক্তারি পড়াবে। কিন্তু এসএসসির রেজাল্টের আগেই তার বাবা পৃথিবী থেকে আকস্মিকভাবে বিদায় নেন। পরিবারের বড় ছেলে হওয়াতে জয়ের ওপর

পুরো পরিবারের দায়িত্ব নেমে আসে। সে এখন একটা কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। তার জন্য একটা স্নেহের অনুভূতি টের পেলাম। তাকে বললাম, তুমি প্রাইভেটে পড়াশোনা চালিয়ে যাও।
কথাবার্তার ফাকে আমার গন্তব্যে পৌছে যাই।
বিদায় নেয়ার আগে সে বললো, আপু, দোয়া করবেন আমার জন্য, আমি যেন আবার পড়াশোনা করতে পারি। ছাতাটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, এটা আপনি নিয়ে যান, আমি ভিজলে কোনো অসুবিধা হবে না।
ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, থাক আর দরকার হবে না। বৃষ্টি থেমে গেছে।
জয়ের সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি। তবে তাকে মনে রেখেছি। বিপদের বন্ধু জয়। আমাকে, আমার আব্রুকে, সে যেমন ছাতার তলের ছায়া দিয়ে বৃষ্টির দিনে নোংরা লোকগুলো দৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছে তেমনি তার পরিবারকে ভালোবাসার এবং কর্তৃত্বের ছায়া দিয়ে দুর্দিনে রক্ষা করে চলেছে।

রংপুর থেকে

পাচমিশালি

– রাকীব আহমেদ

আমার এক বন্ধুর কাহিনী। তার জ্বর উঠেছে। কিন্তু কলেজে যাওয়াটাও জরুরি। হাটা পথ। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন দেখে সঙ্গে ছাতা নিল না। কলেজ থেকে ফেরার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। যে-সে বৃষ্টি নয়, যাকে বলে কুকুর-বিড়াল বৃষ্টি। সে ভয় পেয়ে গেল। জ্বরটা বাড়লে পরীক্ষা দিতে পারবে না। দৌড়ে একটা বিজ্ঞাপনের বিল বোর্ডের নিচে আশ্রয় নিল। আরো কয়েকজন এসে দাড়ালো। বিল বোর্ডটি এমনভাবে কাত করা ছিল যে, তারা বৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পেল। বৃষ্টি শেষে সবাই যে যার গন্তব্যে রওনা দিল। বন্ধুটি কৃতজ্ঞচিত্তে বিল বোর্ডটির দিকে চেয়ে চমকে উঠলো। সেটা ছিল *শরীফ ছাতার* বিজ্ঞাপন।
মাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম *ধুর ছাতা*। মায়ের এই ছাতা ছিল বিরক্তি প্রকাশের চিহ্ন। আজকের তরুণী-যুবতীদের যেমন দেখা যায় রঙ মাখা দুই ঠোট গোল করে লম্বা সুরে বলছে বো-রিং সেটারই গ্রাম্য প্রকাশ ছিল ধুর ছাতা। এ কারণেই বোধহয় লিঙ্গুইস্টরা বলে থাকেন যে, মানুষের আদি উৎস বোঝার ক্ষেত্রে তার ভাষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ!
থাইল্যান্ড থেকে ছোটমামা একটা ছাতা এনে দিলেন। এটা রাবার বেল্টের সাহায্যে মাথাতেই আটকে থাকে। ধরার হাতল নেই। মিনি সাইজের এ ধরনের ছাতা ব্যবহারে দুই হাত মুক্ত থাকে বলে অনায়াসে সব কাজ করা যায়। থাইল্যান্ডে সবাই ব্যবহার করলেও আমাদের সংস্কৃতিতে এর ব্যবহার নেই। ফলে একদিন স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কারণে নাম হয়ে গেল ছাতা মাথা।
ছেলেবেলায় একটি গল্পে চমৎকৃত হয়েছিলাম। এক বুদ্ধিমতি মহিলা বাঘ থেকে বাচার জন্য রঙ বেরঙের ছাতা মেলে ধরেন। আর এখন শুনি পাওনাদারকে দেখে দেনাদার ছাতা মেলে ধরে। গ্রামে গেলে এখনো মাঝে মধ্যে দেখি প্রভাবশালীদের মাথায় ছাতা ধরে আছে কেউ।
বাবা সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখার উপদেশ দিতেন। প্রায়ই তিনি গরম মাথার উদাহরণ দিতেন গল্পটির মাধ্যমে। এক ব্যক্তি ছাতা মাথায় দ্রুত ঘরে ফিরছেন। চৈত্রের প্রচণ্ড গরম তার উপর বাজারে ঝগড়া করে মাথা অতিশয় উত্তপ্ত। খেয়েই কোর্টে যেতে হবে। একটার মধ্যে পৌছতেই হবে। তিনি ভাবছেন

গিয়েই দরজার কোণে ছাতা রেখে চেয়ারে বসে স্ত্রীকে ভাত দিতে বলবেন। ত্বরিত গতিতে তিনি ঘরে ঢুকে ছাতাটি চেয়ারে রেখে দরোজার কোণে দাড়িয়ে রইলেন। স্ত্রীর ডাকে তার সংবিৎ ফিরে এলো।

একটি পুরনো কৌতুক। সিনেমা দেখে ভুলো মনের এক ব্যক্তি ঘরে এসে হৃষ্টচিত্তে স্ত্রীকে বললেন, তুমি শুধুই আমার ভুলো মন নিয়ে খোটা দাও, এই দেখো, আজ ঠিক ঠিক ছাতা নিয়ে এসেছি।

স্ত্রী অবাক হয়ে ছাতার দিকে চেয়ে বললেন, আজ তো তুমি কোনো ছাতা নিয়ে বের হওনি, এটা কার ছাতা?

স্কুলে পড়ার সময় একদিন মুক্তাদের বাসায় যাই সবাই মিলে। আসার সময় ইচ্ছা করেই ছাতাটা ফেলে আসি। ছাতা আনার ছুতোয় আরেকবার যাওয়া যাবে, আর যাওয়া মানে আরেকবার মুক্তার সঙ্গে দেখা হওয়া।

সিলেট থেকে

শাপে বর

– এবিএম রাশেদুল কবির পাভেল

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। ভালো ছাত্র ছিলাম। আমাকে মুক্তাগাছার একটি কোচিংয়ে ভর্তি করতে বাবা নিয়ে এলেন। কোচিংয়ের নাম ক্লাসিক কোচিং সেন্টার। সকালবেলা এসেছিলাম। কোচিংয়ে ক্লাস চলছিল। ক্লাসে ঢুকেই অনেক বন্ধুবান্ধব পেয়ে গেলাম। সিটে বসতেই চোখ পড়লো অপরূপ সুন্দরী মায়াবী চেহারার এক মেয়ের দিকে। কাজলকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো তার নাম নার্গিস। পরবর্তী কয়েকদিনে আবিষ্কার করলাম, নার্গিসই হচেছ আমাদের কোচিংয়ের সেরা সুন্দরী। টানা চার মাস চেষ্টা করলাম তাকে নিজের করে পেতে। কিন্তু আমাকে সে পাত্তাই দিতো না। এরপর হঠাৎ করেই যেন সুযোগটা এসে গেল।

তখন বর্ষাকাল। সকাল সাড়ে নয়টার মতো বাজে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সকালে ছাতা নিয়েই এসেছিলাম। আমার ছাতাটা ছিল কোচিংয়ের বারান্দায়। আমার কয়েকজন বন্ধু খুব দুষ্ট। তারা নার্গিসের সঙ্গে শলা–পরামর্শ করে আমাকে অপদস্থ করতে চেয়েছিল। তারা আমার ছাতার কাপড়ের সবগুলো গিট্টু খুলে রেখেছিল।

তাদের পরিকল্পনাটা ছিল এ রকম :

নার্গিস ছাতার অভাবে বাড়ি যেতে পারছে না। তারা আমাকে নার্গিসকে বাড়ি পৌছে দেয়ার জন্য বলবে। আমি নার্গিসকে পৌছে দেয়ার কথা বললে সে রাজি হবে এবং মধ্য পথেই ঘটবে ছেড়া ছাতার অঘটন এবং আমি পাবো লজ্জা।

এটা আমি জানতাম না। তারা তাদের প্ল্যান মতো কাজ করে রেখেছে। আমিও তাদের কথামতো নার্গিসকে পৌছে দেয়ার কথা বললাম। নার্গিসও রাজি। কিন্তু যেই না ছাতা মেলে বৃষ্টির মধ্যে এসেছি ঠিক তখনই কি এক আশ্চর্য কারণে আমার ছাতার কাপড়টা পড়ে গেল।

আমি আর নার্গিস মুহূর্তেই ভিজে জবজবে। আর সকলের কি হাসি। আমি খুব লজ্জা পেলাম। আরো খারাপ লাগলো যখন দেখলাম নার্গিসও হাসছে। আমার বুঝতে বাকি রইলো না যে, এটা তাদেরই কাজ। আমার চোখ ফেটে কান্না আসছিল। কিন্তু সকলের সামনে কেদে ফেললে আরো লজ্জা। তাই রাগে আমার ব্যাগ ও ছাতা নার্গিসের সামনে ফেলে চলে এলাম।

পরদিন মন খারাপ করে কোচিংয়ে এলাম। ছুটির পর স্যারের সঙ্গে কথা বলার জন্য ক্লাসে বসে আছি। সবাই চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর দেখি আমার ব্যাগ ও ছাতাটা হাতে নিয়ে আমার কাছে নার্গিস এসে বললো, পাভেল, আমি দুঃখিত, আমাকে মাফ করে দাও। এই কথা বলে সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কি মনে করে আবার সে থেমে হঠাৎ করে বললো, পাভেল, আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি।
এ কথা শোনার পর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, নার্গিস তোমাকে আমি এভাবে পেয়ে যাবো তা কখনো ভাবিনি।
আমার দুই চোখে তখন পানি ঝরছে। নার্গিসের মাথা আমার বুকের মধ্যে। আমি তখন বুঝতে পারলাম সেও আমার বুকের মধ্যে কাদছে।

মুক্তাগাছা থেকে

নাম্বার

– খান নূরুল মোমেন সোহেল

বাজার থেকে এলে, তোমার ছাতা কোথায়? আব্বাকে বললেন আম্মা।
আব্বা বললেন, তাই তো, ছাতা কোথায়, সেটা কোথায় রেখে এলাম মনে করতে পারছি না।
ছোটভাই রুবেল হিসাব করতে বসে গেল আব্বা এটি নিয়ে কয়টি ছাতা হারালেন। কিছুক্ষণ পর রুবেল ঘোষণা করলো, আব্বা ছয় নাম্বার।
ছয় নাম্বার মানে, আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন।
ছয় নাম্বার অর্থাৎ এটি নিয়ে তুমি ছয়টি ছাতা হারালে। রুবেল বললো।
আমরা তখন মানিকগঞ্জে থাকতাম। অফিসের কাজে আব্বাকে ঘিওর, ঝিটকা, তরা ইতাদি জায়গায় টুরে যেতে হতো। তখন আব্বা প্রায়ই ছাতা হারাতেন। এবং এই ছাতা হারানো নিয়ে আম্মার কিছু বাকা উক্তি আব্বাকে শুনতে হতো। আব্বা ছাতা নিয়ে বাইরে বের হলে আমরা একটা আশঙ্কায় থাকতাম এই বুঝি আব্বা ছাতা হারালেন।
এখন আর আমাদের আব্বাকে নিয়ে ছাতা হারানোর কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ আব্বা আমাদের ছেড়ে চিরতরে না ফেরার দেশে চলে গেছেন সেই পনেরো ষোল বছর আগে। এখনো ছাতা হাতে নিলে হঠাৎ করেই আব্বাকে মনে পড়ে। কারণ আব্বা ছিলেন আমাদের পরিবারে ছাতা স্বরূপ। আব্বার আকস্মিক মৃত্যুর পর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আমাদের মাথার ওপর থেকে ছাতাটা সরে গেল। মাথার ওপর ছাতা না থাকলে রোদে বা বৃষ্টিতে শরীর যেমন রোদে পুড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে যায় তেমনি আব্বা মারা যাওয়ার পর আমাদের পরিবারেও সে রকম অবস্থা হয়েছিল।

মুক্তগাছা, ময়মনসিংহ থেকে

স্বাভাবিক

– কেএম ইসতিয়াক

আমাদের অফিস পাড়ার মিস তৃষ্ণা তার সুন্দর ভুবন ভোলানো হাসির জন্য বিখ্যাত। তৃষ্ণা যখন কোমর দুলিয়ে তার অফিস থেকে নেমে নিরাপদ বাসস্টপেজের দিকে এগোতো তখন অনেক দিন তার

পেছন পেছন এগিয়ে যেতাম। তৃষ্ণা আমাদের অফিসের ওপর তলায় বিখ্যাত ইনশিওরেন্স কম্পানিতে চাকরি করতো। আমি অফিস শেষে প্রায়ই তার জন্য অপেক্ষা করতাম যাতে এক সঙ্গে *নিরাপদ* বাসে পাশাপাশি নিরাপদে বসা যায়। কিন্তু একবারও তা সম্ভব হতো না। কারণ টিকেট কেটে গাড়িতে উঠে সে কোন মহিলার পাশে বসে পড়তো আর আমি ফার্মগেটে পৌছানোর জন্য তিন টাকার স্থলে দশ টাকা দিয়ে পৌছাতাম ওই মতিঝিল থেকে। এক সঙ্গে টিকেট কাটতে গিয়ে, লাইন দিয়ে গাড়িতে উঠতে গিয়ে বেশ কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছিল তার সঙ্গে। এইতো কয়েকদিন আগের ঘটনা। আমি অফিসের নিচে দাড়িয়েছিলাম। কারণ বৃষ্টি পড়ছিল বেশ জোরে। অফিস শেষে সবাই নিচে জড়ো হয়ে দাড়ানো ছিলাম। এমন সময় সবাইকে ঠেলে তৃষ্ণা বেরিয়ে রাস্তায় নামলো হাতে একটা নীল রঙের পৃন্টের ছাতা।

পেছন ঘুরে তৃষ্ণা ডাকলো, এই যে ভাই, চলুন, এক সঙ্গে স্টপেজে যাই।

বুকের ভেতর আমার ধড়ফড় করে উঠলো। এরপর তার ছাতার নিচে আশ্রয় নিলাম।

বৃষ্টি হতে রক্ষা পেতে দুজনে খুব কাছাকাছি গা ঘেষে হাটতে থাকি। তার শরীর থেকে তীব্র পারফিউমের গন্ধ নাকে এসে লাগতে লাগলো। তার ডানপাশ পেছনের কিছু অংশ ভিজে শরীরের সঙ্গে শাড়ি লেপটে থাকলো। এতে কোমরের ভাজ স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল আমার সামনে। এরপর টিকেট কেটে গাড়িতে ওঠার পালা। উত্তরার দুটি টিকেট কিনলাম।

তৃষ্ণা বললো, আপনি কি উত্তরায় থাকেন?

বললাম, না, আপনাকে পৌছে দিতে আর আপনার সঙ্গ পেতে এই ব্যবস্থা।

জানতে পারলাম সে আমাকে আগে থেকেই লক্ষ্য করতো আর এটাও সে জানতো আমাদের অফিস দুটি একই বিল্ডিংয়ে। অফিস টাইমের পরে এমনিতেই যানজট থাকে আর ওই দিন বৃষ্টির জন্য আরো দীর্ঘ যানজটে পড়লাম।

হালকা ভেজা শরীরে তৃষ্ণা আমার গা ঘেষে বসে আছে এ অবস্থায় নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না। আমার হাত প্রথমে তার পেটের দিকে এগোলো, এতে তৃষ্ণা বাধা দিল না। এরপর তার বাধাহীন মৌন সম্মতিতে আমার হাত তার পেট থেকে উপরের দিকে উঠে গেল। ব্লাউজের নিচ থেকে হাত ঢুকিয়ে তার রাগবি বলের মতো বুক আমার হাতের ভেতর দলিত হচ্ছিল। প্রচণ্ড আবেগে তার শরীর কাপছিল। হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বললো, আপনি ফার্মগেটেই নেমে যান। আজ উত্তরা পর্যন্ত গেলে আমি স্বাভাবিক থাকতে পারবো না।

বললাম, আমি স্বাভাবিক কিভাবে হবো?

তৃষ্ণা বললো, সেটা আরেকদিন করে দেবো।

পরপর বেশ কয়দিন আমাদের নিরাপদে ভ্রমণ হলো। হঠাৎ করে তৃষ্ণা একদিন আমাদের অফিসে এলো। জানতে পারলাম অফিসের মার্কেটিং ম্যানেজারকে ইনশিওরেন্স করাতে সে এসেছে।

পরদিন থেকে হঠাৎ পরিবর্তন দেখি তৃষ্ণার মধ্যে। দেখি সে যেন কেমন এড়িয়ে চলছে।

আমিও কিছুটা এড়িয়ে চলতে লাগলাম। এরপর একদিন সন্ধ্যার আগে অফিসের নিচে দাড়িয়ে আছি। তৃষ্ণা ও আমাদের মার্কেটিং ম্যানেজার হাজির এবং একইভাবে তৃষ্ণার ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়ে আমার সামনে দুজন হেটে এগিয়ে গেল।

ঢাকা থেকে

নয়টি গুণাগুণ

– ওহাব

ছাতা বৃষ্টির দিনের বন্ধু, রোদের দিনের সখা। আসুন এবার ছাতা সমন্ধে বলি নয়টি গুণাগুণ :

এক. মেয়েদের ত্বক তুলনামূলকভাবে কোমল। বৃষ্টিতে কিংবা রোদে বের হলে ছাতা নিয়ে নিন হ্যান্ড ব্যাগে। এতে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য অনেক রক্ষা পাবে।

দুই. বাসায় ডিশ নেই? নো চিন্তা। বড় একটি ছাতা খুলে ছাদে উল্টো করে বেধে রাখুন। শাহরুখ–কাজলকে দেখা না গেলেও দূর থেকে লোকে একে ডিশ বলেই জানবে।

তিন. প্রিয়জনকে ছাতা উপহার দিন। রোদে কিংবা বৃষ্টিতে আপনার ছাতার ছায়া তখন তার কাছে ভালোবাসার ছায়া বলেই মনে হবে।

চার. ঘটক হতে চান? এ জন্য আপনার থুতনির নিচে গোটাকয়েক দাড়ির সঙ্গে অবশ্যই একটি মানানসই ছাতা থাকতে হবে।

পাচ. ঝড়ের সময় বাতাসের প্রতিকূলে ছাতা ধরে হাটুন। তা না হলে ছাতা উল্টে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ছয়. কালোর চেয়ে শাদা রঙ উৎকৃষ্ট তাপ বিকিরণ মাধ্যম। ছাতা তৈরিতে এ জন্য ধবধবে শাদা রঙের কাপড় ব্যবহার করুন।

সাত. বর্ষা মরসুমে নিয়মিত ছাতা নিয়ে কলেজ–ইউনিভার্সিটিতে যাবেন। হঠাৎ বৃষ্টিতে আপনার বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের রানীর মুখে শুনতেও পারেন এক্সকিউজ মি, আমাকে একটু হেলে পৌছে দেবেন?

আট. ঘরোয়া পরিবেশে স্বাস্থ্যসেবা পেতে চান? চলে আসুন *সবুজ ছাতা স্বাস্থ্য ক্লিনিকে*। পাবেন ছাতার নিচের ছায়ার মতোই কোমল স্বাস্থ্যসেবা।

নয়. বৃষ্টি কি আপনাকে খুব কাছে টানে? তাহলে ছাতা নামের উটকো ঝামেলাটার দরকার কি? বেরিয়ে পড়ুন ছাতা ছাড়াই। রোমান্টিক মুডে গেয়ে উঠুন –

আজ ছাতার আর নেই কোনো প্রয়োজন
হাতে এসে ধরো হাত হে প্রিয় সুজন।

দক্ষিণ শ্যামপুর, সাভার থেকে

রেইনী

–– আবু হানিফ মোহাম্মদ আবদুল আহাদ

১৯৯৬ সালের শেষের দিকে। আমরা তখন ওদের বাসায় ভাড়া থাকি। এইচএসসি–র ছাত্র আমি সকাল সাতটার দিকে বেরিয়ে যাই কলেজের উদ্দেশে। আর সে তখন ক্লাস এইটের ছাত্রী। তার ক্লাস সাড়ে সাতটা থেকে।

তার ফ্যামিলি ছিল খুবই লেইট রাইজার টাইপের। তাই মাঝে মধ্যেই তার স্কুল কামাই হতো। একদিন সকালে বের হলাম ঠিক যখন বৃষ্টি শুরু হলো। স্বভাবতই ঘর থেকে ছাতা নিয়ে বের হলাম কলেজের উদ্দেশে। আমাদের গেট থেকে একশ দেড়শ গজ দূরে যেতেই একটা বিল্ডিংয়ের কার্নিশের নিচে ওকে মানে রেইনীকে দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ওর সামনে দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে চলে যেতে

নিজেকে খুব কাপুরুষ মনে হলো। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, ছাতা ছাড়া বেরিয়েছো কেন?

বৃষ্টি শুরু হয়েছে আমি বের হবার পর।

তুমি স্কুলে যাবে তো?

স্কুল ড্রেস পরে আর কোথায় যাবো? একটু সজোরেই বললো যেন।

আমাকে একটু হেটেই বাসে উঠতে হতো। চিন্তা করলাম দশ পনেরো মিনিট দেরি হলে আর কি সমস্যা? ওকে কি স্কুলে পৌছে দিয়ে আসবো?

আমি ডাকার আগেই দেখি ও আমার ছাতার দিকে চলে এসেছে। ছাতার ভেতরে দুইজন হাটাতে ভিজতে লাগলাম। সিঙ্গল ছাতায় দুইজন জড়াজড়ি করে গেলেও ভিজে যাবারই কথা। যদিও আমি সাহস করে ওকে ধরতে পারছিলাম না। এবং ওকে ছাতার নিচে রাখতে গিয়ে এবং যাতে শরীর লেগে না যায় সেভাবে নিজে বাইরেই ছিলাম। কিন্তু মিনিট দুয়েকের মধ্যে রেইনী আমার কনুই বরাবর হাত দিয়ে শরীরটা জড়িয়ে ধরে হাটতে লাগলো।

দশ মিনিটের মতো ভিজে যখন স্কুল গেটে পৌছাই তখন দুজনই কাকভেজা।

সরি, লাভ হলো না, সেই তো ভিজেই গেলে।

তুমিও তো বেশি ভিজেছো।

আমরা ওদের বাসার নিচ তলায় থাকতাম এবং ছোটবেলা থেকেই চিনতাম অর্থাৎ পরিচয় ছিল বলে, আমাকে তুমি করেই রেইনী বলতো।

তুমি মেয়ে, বেশি ঠাণ্ডা সইতে পারবে না। শেষে সর্দি–টর্দি বাধিয়ে বসো কি না কে জানে!

যার নাম Rainy তাকে তুমি বৃষ্টির হাত থেকে বাচাবে কি করে? হাসতে হাসতে বললো সে।

ওর ঠাট্টা যেন আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করে গেল।

রেইনীকে বৃষ্টির হাত থেকে কেউ যদি বাচায় সে আমিই, অন্য কেউ না। খুব সাহস করে বলে ফেললাম।

দেখা যাবে তখন।

আমার কথা আমি রেখেছি। আমি পেরেছি আমার রেইনীকে বৃষ্টির হাত থেকে তথা সকল বিপদ–আপদ থেকে রক্ষা করতে অন্তত এখন পর্যন্ত। ডেটিংয়ের সময় যখন আমার বুকে মাথা রেখে রেইনী বলে, *খুব ভালোবাসি তোমায়* তখনই ছাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যায়। ছাতা আমাকে শিখিয়েছে রেইনীকে রক্ষা করতে যা না হলে আমার জীবন পূর্ণ হতো না।

ঢাকা থেকে

দূরে কোথাও

– শিহাব

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খেয়াল হলো দেরি হয়ে গেছে। তানভীর রেডি হয়ে এখন চুল আচড়াচ্ছে। আটটা বেজে পাচ, ছেলেমেয়ে দুটা নিশ্চয়ই স্কুলে চলে গেছে। শিগগিরই বের হতে হবে। তাই আর আলসেমি না করে ঝটপট রেডি হলাম। বিশ মিনিটের মধ্যেই দাড়িগোফ কামিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে যখন বুটের ফিতা লাগাচ্ছি তখন তানভীর ওর মায়ের মানে আমার শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলা শেষ

হলো। আজ বাচ্চা দুটো নানুর বাসায় থাকবে। স্কুল ছুটি হলে ড্রাইভার রেখে আসবে। চিরুনিটা তিন বার করে মাথায় চালিয়ে আয়নাতে একবার নিজেকে দেখে নিয়ে বললাম চলো। ড্রাইভার আগেই গারাজ থেকে গাড়ি বের করে রেখেছিল। চাবিটা নিয়ে ওকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসলাম। তানভীর উঠে পড়তেই স্টার্ট দিলাম।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। মেডিকাল ক্যাম্পাসের ভেতরটা একবার চক্কর দিয়ে এলাম। কোচিংটার সামনে অনেক ছাত্রছাত্রীর ভিড়। বোধ হয় এক ব্যাচ ছুটি হলো। এবার চললাম একটা রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট সারতে। রাজশাহীতে সবেমাত্র এসব দামি রেস্টুরেন্ট চালু হয়েছে। ঝকঝকে তকতকে। চারপাশ কাচ দিয়ে ঘেরা। এসি চলছে। দুজন একান্তে বসার জন্য বেশি চার্জের কেবিনের ব্যবস্থা আছে। একটা কেবিনে ঢুকে খাবারের অর্ডার দিয়ে তার সম্মতি চাইতেই মিষ্টি হাসলো। দুই সন্তানের জননী। জেনেটিক্স অ্যান্ড বৃডিং থেকে পাস করে লেকচারার হয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছিল ছয় বছর আগে। কিন্তু দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। বাইরে এবার বেশ ভালোই বৃষ্টি নেমেছে। সেই বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হারিয়ে গেলাম বারো বছর আগে।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ভালো জায়গায় ভর্তির জন্য ক্যাম্পাসের সেই কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছি। বেশ বর্ষা নেমেছিল সে বছর। ছাতাটা শুকানোর জন্য ঘরের এক কোণায় রেখে বন্ধুদের সঙ্গে বসে আড্ডা মারা শুরু করলাম। ক্লাস শুরু হতে এখনো কিছুক্ষণ দেরি আছে। যথারীতি শুরু এবং শেষ হলো ক্লাস। কি সব জটিল অংক। বেশির ভাগই বুঝি না। তবে খাতায় সব তুলে রাখি। বিকেলের দিকে বন্ধুরা মিলে ডিসকাস করলেই সব সমাধান হয়ে যায়। ক্লাস শেষে একটু দেরিই হলো বের হতে। যেই ভাইয়া ক্লাস নিচ্ছিল তার সঙ্গে ইলেকট্রনিক্সের সেমিকন্ডাকটর নিয়ে রীতিমতো তর্ক শুরু করে দিয়েছে সাখাওয়াত, আমাদের ফার্স্ট বয় এসএসসি-তে প্লেস পাওয়া ছাত্র। আমরাও তাল মিলিয়ে চলেছি ওর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত জয় আমাদেরই হলো। ছাতা নিতে এসে দেখি আমারটার বদলে একই রকম অন্য একটা ছাতা আছে। কোনো সমস্যা নেই। আগামীকালই নিয়ে যাবো কারণ ওতে আমার নাম লেখা আছে।

পরদিন ক্লাসে এসে দেখি বন্ধুরা কেউ নেই। খাতা বের করে অংকগুলো দেখছি এমন সময় একটা মেয়ে এসে বললো, সরি, ভুল করে তোমার ছাতাটা কাল নিয়ে গিয়েছিলাম।

ও আচ্ছা, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে পাশে টেবিলের দিকে দেখিয়ে আবার অংকে ডুব দিলাম। ওখানে তার ছাতাটা রাখা আছে।

ওমা, এই অংকটা তো আমি পারিনি।

কথাটা শুনে মেয়েটার দিকে কটমট করে তাকাতে গিয়েই হোচট খেলাম। ভীষণ সুন্দরী। অংক করার সময় কেউ ডিস্টার্ব করলে আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু এই মেয়ের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেয়া যায় তাই গল্প শুরু করলাম।

সেই শুরু। তারপর আমি বুয়েটে এবং সে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে। যোগাযোগ কিন্তু ছিন্ন হয়নি। পাস করেই ভালো চাকরি পেয়ে গেলাম। কোনো পরিবার থেকেই আপত্তি আসেনি।

ছাতাটা আজো আছে আলমারিতে তোলা। ওই দিনটাতে আমরা দুজন শুধু দুজনার জন্য। দূরে কোথাও চলে যাই। সারাটা দিন অজানা, অচেনায় জায়গায় ঘুরে ফিরি রাতে। সে ভয় করতো, আমরা পুরনো হয়ে যাবো না তো? সেই ভয় আমরা কাটিয়ে উঠেছি। ছাতার মাধ্যমে আমাদের পরিচয়। এখন একই ছাতার তলে আমাদের অবস্থান। আছে আস্থা, স্নেহ, মায়া, মমতা।

নাশতা চলে এসেছে। প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বললো, স্বপ্ন শেষ হলো?
হাসলাম শুধু।
জিজ্ঞাসা করলাম, আজ কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?

রাজশাহী থেকে

জল বিয়োগ

– রমেন সাহা

রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা হবে। বর্ষাকাল। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিদিনের মতো আড্ডা শেষে বাড়ি ফিরবো। কিন্তু বৃষ্টির জন্য বের হতে পারছি না। সঙ্গে একটা কাঠের হাতলওয়ালা ছাতা আছে। যে বৃষ্টি তাতে ছাতায় কুলাবে বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে পেটে প্রচণ্ড নাইট্রিক এসিড ক্ষরণ হচ্ছে। যাহোক, বৃষ্টির মধ্যেই পায়ে হেটে ছাতাটা নিয়ে রওনা হলাম।

মফস্বলের থানা শহর। এই মাত্র বিদ্যুৎ চলে গেল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাসার সামনে প্রায় চলে এসেছি। এদিকে আমার ভীষণ প্রস্রাব পেয়েছে। আর বৃষ্টি এতো জোরে পড়ছে যে, বসে কাজটা করা সম্ভব না। লুঙ্গি, শার্ট ভিজে যাবে।

রাস্তায় কোনো জনমানব নেই বলে মনে হচ্ছে। তাই রাস্তার পাশে একটা প্রাচীরের গায়ে পরনের লুঙ্গি উঠিয়ে দাড়িয়ে শুরু করে দিলাম। মনে হলো যে,পৃথিবীর সব সুখ এই জল বিয়োগ করার মধ্যেই। দড়দড় করে বৃষ্টি ধারার মতো পড়ছে।

কাজ প্রায় শেষের দিকে। হঠাৎ কাশির শব্দসহ সামনে একটা ছাতা ভেসে উঠলো। আমি দৌড়ে গিয়ে বাসায় ঢুকলাম।

আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে, লোকটা ছাতা মাথায় অন্ধকারে আমারই সামনে আগে থেকে বসে প্রস্রাব করছিল। আমি তার ছাতার ওপর...।

যাই হোক আর যতো লজ্জার কথাই হোক, ছাতাটাকে অশেষ ধন্যবাদ বয়স্ক লোকটাকে গরম জলে না ভেজানোর জন্য।

বদরগঞ্জ, রংপুর থেকে

বিশ্বাস

– মাহজাবীন হোসেন

আমার খালাতো বোন সপরিবারে সউদি থাকেন। সে বছর দুলাভাই দেশে এলে খুব করে বললেন আমার কিছু চাই কি না। বরাবরই কারো কাছে কিছু চাওয়া মানে লজ্জার ব্যাপার মনে হয়। তবুও অনেক করে বলায় চার ফোল্ডিংয়ের একটি ছাতার অনেক শখ ছিল আমার। দেখতে সুন্দর এবং সহজে বহনযোগ্য। তাই লিখে জানাতেই দুলাভাই হয়তো বুঝতে পারেননি। তিনি দুই ফোল্ডিংয়ের একটি ছাতা পাঠালেন। অবশ্য গিফট ভেবে ভালোই লাগলো ছাতাটা।

সেদিন ছিল ১৯৯৯ সালের এইচএসসি বাংলা সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার দিন। সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি চলছিল। পরীক্ষা শুরুর প্রায় আধা ঘণ্টা আগে থেকে আমার মেজবোনকে পরীক্ষার হলে

পৌছানোর জন্য গলির মুখে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু প্রায় শূন্য রাস্তায় একটাও খালি রিকশা পাওয়া যাচ্ছিল না। দুই বোন এক ছাতার নিচে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। এদিকে সময় তার আপন গতিতেই চলে যাচ্ছে। আমাদের বাসা থেকে প্রায় বিশ পচিশ ফুট গলির পরেই মূল রাস্তা। অর্থাৎ গলির মুখ থেকে তাকালেই বাসার গেট দেখা যায়।

তখন দশটা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি। এ সময়ে একটা খালি রিকশা পেয়ে কোনো ভাড়া না বলেই উঠে পড়লাম। একে তো টেনশন তার ওপর বৃষ্টি। এই সঙ্কটময় সময়ে ছাতাটাকে একটা বোঝা মনে হলো। তাছাড়া বৃষ্টি কমে গেলে ছাতাটা কোথায় রাখবো ভেবে গলির মুখে সম্পূর্ণ অপরিচিত ষোল সতেরো বছরের একজন ছেলের হাতে ছাতাটা দিয়ে বললাম, ওই যে গেট দেখা যায় সেই বাসায় নক করে কষ্ট করে ছাতাটা পৌছে দিও। ছেলেটার নিজের মাথার ওপরেও একটা ছাতা ছিল।

সে বললো, ঠিক আছে।

পরীক্ষা শেষে বোনকে নিয়ে বাসায় এসে শুনি ছাতার ব্যাপারে কেউ কিছুই জানে না। সব বলার পরে সবাই আমার বোকামির জন্য আমাকে দায়ী করলো। নিজের কাছেও খুব খারাপ লাগলো যে, মানুষ এইটুকু লোভ সামলাতে পারে না! এমনি নানান কথা মনে হতে লাগলো। এভাবে দুই দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনে যখন আমি বাড়ি ছিলাম না তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে গেটে নক করে ছাতাটা দিয়েই ছেলেটা ন্যাকি চলে গিয়েছিল। মনে মনে ছেলেটাকে ধন্যবাদ দিয়ে ভাবলাম, আসলেই এখনো বিশ্বাস একেবারে হারিয়ে যায়নি।

ঢাকা থেকে

পরিণতি

– মোহাম্মদ কায়সার আলী রিপন

আরো মাস পাচেক বাকি এসএসসি পরীক্ষার। বিকেল চারটা। স্কুল ছুটি হলো। আমাদের পাড়ার আমরা মাত্র তিনজন ছাত্র। স্কুল ছুটি হতেই প্রচণ্ড বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ওই দিন আমাদের পাড়ার অন্য দুইজন আসেনি। আমি একা। আমাদের পাশের পাড়ার বেলীকে দেখলাম স্কুলের বারান্দায় একা দাড়িয়ে। গতি কমে এলেও হালকা টিপ টিপ করে পড়ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে থামার কোনো লক্ষণ নেই। বেলীর কাছে কোনো ছাতা ছিল না। আমার কাছে একটি ছাতা।

বেলীকে পছন্দ করতাম। তবে কোনোদিন মুখ ফুটে বলিনি। সে জানতো, তাকে পছন্দ করি। তার কাছে গেলাম এবং আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বললাম।

প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেও পরিস্থিতি এবং আমার বারকয়েক বলার ফলে সে রাজি হলো।

আমরা দুইজন হাটছি। নির্জন পথ। রাস্তার দুইপাশে আখ, পাট এবং ধানক্ষেত। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। গ্রাম থেকে বহু দূরের বিজন পথে আমরা পাশাপাশি একই ছাতার তলে হেটে চলেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি তাকে এভাবে একা কাছে পেয়ে যাবো। মাঝে মধ্যে বাতাস এসে শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে যাচ্ছে। আমার পাশ দিয়ে সে হাটলেও কিছুটা দূরত্ব রাখতে সচেষ্ট। ইচ্ছা করে অনেকটা তার সঙ্গে ঘেষে হাটতে চেষ্টা করছি। তার মৃদু আপত্তি আমাকে উত্তেজিত করে তুললো। মন কল্পনায় মেতে উঠলো।

গ্রাম আরো বেশ দূরে। আমার ডান হাতটা তার ঘাড়ে পড়লো। সে হাতটা সরিয়ে দিল। আমি আবার তার ঘাড়ে হাত দিতেই হাতটি নিজের অজান্তে যন্ত্রের মতো নেমে গেল তার বুকে। তার জামার ভেতরে। ব্রা না থাকায় জামার নিচে কোনো বাধা হলো না। একটা মৃদু চাপ পড়লো তার অগঠিত স্তনে। সে ত্বরিত বেগে ছাতা থেকে বের হয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে দিল দৌড়। আমি বোকার মতো হা করে দাড়িয়ে রইলাম। শুধু ভাবলাম একি হলো!

রাতে ছোট একটি বিচার বসলো। বিচারে বেলীর বাবার পা ধরতে হলো আর পিঠের ওপর ভাঙা হলো দুটি কঞ্চির লাঠি। প্রতিজ্ঞা করলাম মনে মনে, বেলীর সঙ্গে এক দিনের জন্য হলেও প্রেম করবো। তার সমস্ত দেহ নেড়ে দেখবো, শুধু নেড়ে।

এরপর শুরু হলো চেষ্টা। প্রথমে তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। পরে শত রকমের চেষ্টা। তাতেও হলো না। অবশেষে হাত কেটে দেখালাম। রক্ত দিয়ে চিঠি দিলাম। একে ধরলাম, তাকে ধরলাম। কিছুতেই কাজ হলো না। বাইরে পড়তে এলাম। ধীরে ধীরে জেদ কেটে গেল। তবু তাকে ভুলতে পারলাম না। বাইরে থেকে এসে যে কয়েকদিন থাকি তা তাকে পাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তবু কাজ হলো না দেখে এবার স্থির করলাম, না, তাকে আর পাওয়ার চেষ্টা করবো না। তাই করলাম। তাকে ভুলেই গেলাম। অথচ মজার ব্যাপার, সে আজ আমার বিবাহিত বৌ। কারণ এখন আমি একটি ভালো চাকরি করি।

চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

জন্মদিনে

– জান

গত ১ আগস্ট ছিল আমার জন্মদিন। প্রিয়জনের কাছ থেকে জন্মদিনে প্রত্যেকেই কিছু আশা করে। ক্যাসেট, চকলেট, কার্ড কতো কি! তেমনি আমিও উপহারের অপেক্ষায় ছিলাম। আমার জন্মদিনে কৃষ্ণকলির উপহার ছিল একটা ছাতা আর এক পাতার চিঠি। ভালোবাসায় মিশ্রিত সেই চিঠি।

জান

প্রথমে আমার আদরসহ চুমু তো থাকবেই, সেই সঙ্গে ছাতা। ছাতা কেন? যাযাদির পরবর্তী বিষয় ছাতা তাই। বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে কেমন আছো তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আশা করি টেন্ডার পেলে বেকারত্ব দূর হবে। বিধাতা যদি নিরুপায় না হন তাহলে আমাদের একটা উপায় অবশ্যই হবে। পারিবারিক সকল বাধা অতিক্রম করে আমরা একদিন মিলিত হবোই।

আগামী জন্মদিনের আগেই আমরা এক ছাদের নিচে আসবো। তোমাকে নিয়ে আমার সারাদিনের চিন্তা, তোমাকে নিয়ে আমার সারাদিনের ব্যস্ততা। এট লাস্ট হানড্রেড কিস দিয়ে ফিনিশ করছি।

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলির জন্য আমার ভালোবাসায় কমতি নেই একটুও। ধর্মীয় সমস্যা না থাকলেও সামাজিক নিয়ম রীতিতে আমাদের মিলনে অনেক বাধা। ভালোবাসার ছাতা কি আমাদের রক্ষা করতে পারবে?

রংপুর থেকে

তফাত

– শফিকুর রহমান

আমার প্রিয় একটি ছাতা ছিল। ছাতাটা অপরাজিতা দিয়েছিল। শুধু ছাতা হারাতাম। প্রায়ই বৃষ্টিতে ভিজে ক্যাম্পাসে পৌছাতাম। এ অবস্থা অপরাজিতার সহ্য হচ্ছিল না। একদিন সে দোকানে নিয়ে গেল। অনেকটা জোর করেই। ছাতা পছন্দ করতে বললো সে।

ছাতা কেন?

সে বললো, তোমাকে আমি ভালোবাসি তাই।

ভালোবাসার কথা শুনে পুলক অনুভব করছিলাম। শরীরের পশম সব দাড়িয়ে গেছে। ভাবছিলাম, ভালোবাসার কথা কেউ এভাবে বলে? কিছু বলতে পারিনি তখন। ক্যাম্পাসে এসে অপরাজিতাকে জড়িয়ে ধরে একটা আলতো চুমু দিয়েছিলাম। কারণ অপরাজিতাকেও আমি ভালোবাসি।

অপরাজিতার দেয়া ছাতাটা হারাইনি। যত্নের সঙ্গে এখনো আছে। নেই শুধু অপরাজিতা। তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

আজ যখন মাথার ওপর অপরাজিতার ছাতাটা থাকে, তখন বৃষ্টি আর অশ্রু একাকার হয়ে যায়, এ দুয়ে তখন খুব একটা তফাত থাকে না।

বানারীপাড়া, বরিশাল থেকে

হঠাৎ দেখা

– সোহানা

আষাঢ় মাস শেষ হতে চললো। সে রকম বৃষ্টির নাম-গন্ধ পাচ্ছি না। প্রতিদিন একটা লেডিস ছাতা নিয়ে বের হই। ইতিমধ্যে আমার ওপর *ছাতাওয়ালি* নামের সিল পড়ে গেছে। কলেজে আমার এই নিয়মিত ছাতাবহন নিয়ে টিটকারিও চলে। তবে আমার অভ্যাস ত্যাগ করিনি। আকাশের মেঘগুলোও আমার ওপর একটু সদয় হয় না। ব্যাগে মাথা বের করা একটা ছাতা নিয়ে ঢোকার চেয়ে ছাতা ঝাড়তে ঝাড়তে ঢুকলে কতো সুন্দর দেখায়। বৃষ্টি যে একদম হয় না তা নয়। তবে হস্টেল থেকে কলেজের স্বল্প দূরত্ব পার হতে কখনোই বৃষ্টি নামে না। আমিও কলেজে ঢুকলাম অমনি বৃষ্টি শুরু হলো। আমার সঙ্গে এমনই শত্রুতা।

যাই হোক। আমি ছাতাওয়ালি হয়ে প্রতিদিন নিজের নাম সাটা ছাতা নিয়েই বের হই। বিকেলের এ সময়টা এমনিতেই মন খারাপ করে। তার উপর আকাশের ভাব আজ কেমন যেন থমথমে। মনে হচ্ছে একটু পরেই তার স্বরে কান্না জুড়ে দেবে। তারই প্রাথমিক পর্ব হিসেবে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হলো। মহা আনন্দে ছাতা মেললাম।

হঠাৎ চোখে পড়লো মাঠের পাশে ছোট রাস্তাটা দিয়ে আত্মভোলা ভঙ্গিতে হেটে যাওয়া একজনের দিকে যাকে বেশ অনেক দিন ধরেই আমার চোখ খুজছে। প্রায় মাস দুয়েক না হয় মাস দেড়েক আগে

কলেজেরই একটা প্রোগ্রামে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতা আমার একদমই ভালো লাগে না। তবে ওই ভরাট কণ্ঠের মালিককে ভালো লেগেছিল। তাড়াতাড়ি কাছে গেলাম। বললাম, নয়নভাই, কেমন আছেন? এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলাম যেন কতোদিন ধরে চিনি।

তিনিও আমাকে অবাক করে দিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলেন, ভালো আছি, তুমি?

এবার একটু স্মার্ট হবার চেষ্টা। আপনি তো ভিজে যাচ্ছেন, ছাতার নিচে আসুন।

আরে না, এতো অল্প বৃষ্টিতে কিছু হবে না। তার উত্তর।

বৃষ্টিটা কেন যে খুব জোরে আসছে না। কি আশ্চর্য! এই প্রথম আকাশ আমার প্রার্থনা শুনলো। মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। আর নয়নভাইও বাধ্য হয়ে আমার ছাতার নিচে। ছোট একটা ছাতার নিচে নিরাপদ দূরত্ব রাখার চেষ্টা। দুজনই ভিজলাম সমান।

একটু পরে হঠাৎ বাতাসে ছাতা উল্টে গেল। তাড়াতাড়ি কাছাকাছি একটা দোকানের ছাউনিতে দুজন আশ্রয় নিলাম।

তারপর?

রাস্তা থেকে দোকানের ছাউনি পর্যন্ত সময়টার জন্য আমার ছোট ছাতাটার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তারপর আর কি? বর্ষণমুখর এক বিকেলের কাহিনী এখন নটে গাছটি মুড়োতে চললো।

সিলেট থেকে

অপকারী

– মোহাম্মদ নূরুল আলম জেম

অনেক আগের কথা। আমার আব্বা এক সময় ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলেন। ভালো ফুটবল খেলতেন। এলাকা ভিত্তিক খেলা। আমাদের গ্রামের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অন্য এক গ্রামের। আব্বা আমাদের গ্রামের দলে খেলবেন। আমার মেজচাচা খুব ভালো খেলতে পারতেন না বিধায় দর্শক হিসেবেই গেলেন দলের সঙ্গে। যথাসময়ে খেলা শুরু হলো এবং চলতে থাকলো। চারদিকে অনেক দর্শক এ জন্য চাচাকে একটু কষ্ট করে খেলা দেখতে হচ্ছিল। কারণ চাচা তখন কিছুটা ছোট ছিলেন। খেলা স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। হঠাৎ কি নিয়ে যেন খেলোয়াড়দের মধ্যে শুরু হলো হাতাহাতি। এক পর্যায়ে তা দর্শকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু লোকজন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করলো। চাচার সামনে দাড়িয়ে খেলা দেখছিল একজন বয়স্ক লোক। লোকটির বগলে ধরা ছিল একটি ছাতা। ছোটাছুটির এক পর্যায়ে ওই লোকটিও যখন ওখান থেকে সরে পড়ার উদ্দেশে পেছনে হটতে গিয়েছেন তখন ওনার বগলে ধরে রাখা ছাতাটির পেছনের সুচালো অংশটি পেছনে দাড়ানো চাচার চোখে আঘাত করে। চাচা তখন চিৎকার করে ওঠে। তারপর থেকেই চাচার চোখটি অকেজো হয়ে পড়ে। এ ছোট একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায় কখনো কখনো উপকারী বস্তুও কতোটা অপকারী বা ক্ষতিকারকের ভূমিকা পালন করে।

রাজশাহী থেকে

মামলা ডিসমিস

– শূন্য

ছোটবেলায় বর্ণ পরিচয় শেখার সময় A–তে Apple, B তে Ball এভাবে U–তে গিয়ে পড়তে হতো Umbrella। এক সময় আমার ধারণা হয়ে গেল U দ্বারা Umbrella ছাড়া আর কোনো শব্দ বোধহয় গঠন করা যায় না। U বর্ণটি বরাদ্দ হয়েছে একমাত্র ওই শব্দটি তৈরির জন্য। এভাবে আমাদের জীবনের শুরুতেই আট শিকের এই যন্ত্রটির প্রভাব পড়তে শুরু করে। জীবনে ছাতা ব্যবহার করেনি এমন লোক পাওয়া যাবে না। তেমনি জীবনে ছাতা হারায়নি এমন লোকও বিরল।

বাংলা সাহিত্যে ছাতা প্রসঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া প্রহারের ক্ষেত্রে জুতাপেটার মতো ছাতাপেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রেমিকার পিতা কর্তৃক প্রেমিকের ওপর ছাতা দ্বারা আক্রমণের বহু নজির রয়েছে। আমাদের বন্ধু হারুনও এ রকম ঘটনার শিকার হয়েছিল। সে যখন নূরজাহানের সঙ্গে দেখা করার জন্য নূরজাহানদের বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল তখন নূরজাহানের পিতা হারুনকে দূর থেকে ছাতা দেখিয়েছিল। এরপর পুরো বর্ষাকাল হারুন আর ওমুখো হয়নি।

নির্বাচনের মার্কা হিসেবেও ছাতার ভালো কদর আছে। একবার আমাদের এখানে একটি মিলের সিবিএ নির্বাচন হচ্ছিল। এক দলের মার্কা *গোলাপ ফুল* অপর দলের *ছাতা।* তখন ছিল বর্ষাকাল। ছাতা মার্কাওয়ালাদের তখন সতেরো মজা। আর গোলাপ ফুলওয়ালারা মিছিল করতে করতে বৃষ্টি এলে না পারছে ছাতা খুলতে, না পারছে মাথা বাচাতে।

এক ছাতার মিস্ত্রির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সে একবার আমাকে একটা উপদেশ দিয়েছিল। ভাইজান শোনেন, কাপড় শিক আর ডাণ্ডা এই তিনে ছাতা হয়। যে কোনো একটা নষ্ট হলে মেরামত করাইবেন। দুইডা নষ্ট হলে নতুন ছাতা কিনবেন। ছাতার কাপড়ও নষ্ট, শিকও ভাঙা এমন ছাতার লাইফ শেষ। কেস ফাইনাল, মামলা ডিসমিস।

পাঠকদেরও একই উপদেশ দিচ্ছি, ছাতা মেরামত না করে নতুন ছাতা কিনুন। মামলা ডিসমিস করুন। আরেকটি এবং শেষ উপদেশ হলো প্রবল বাতাসে ও বর্ষণে রমণীয় টিপ ছাতা ব্যবহার করবেন না। কেননা এগুলোর ডিগবাজি খাবার প্রবণতা আছে। মজবুত দেশি ছাতা ব্যবহার করুন।

চট্টগ্রাম থেকে

নছই মাস্টার

– মাছুম আলম

বেশ কিছুদিন আগের কথা। তখন এ দেশ পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের নাগপাশে বন্দী। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের এই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। শহর এলাকার অবস্থা অথৈবচ হলে গণ্ডগ্রামের অবস্থা নিশ্চয় তার চেয়ে শতগুণ খারাপ ছিল। সে রকমই এক গ্রাম আমাদের বলদী। সে সময়ে শিক্ষার আলো জ্বালানোর জন্য কোনো ইট–পাথরের

প্রতিষ্ঠান আমাদের এলাকায় গড়ে ওঠেনি। চারদিকে অশিক্ষা আর কুশিক্ষায় যখন ছেয়ে গিয়েছিল তখন আলোর মশাল হাতে একজন এগিয়ে এসেছিলেন।

কিশোর আর তরুণরা যখন গরু চরিয়ে বেড়াতো, গাছের নিচে বসে বাশি বাজাতো, দুই আঙুলের ফাকে বিড়ি নিয়ে মুখে লাগিয়ে টানতো তখন ওই আলোর মশাল হাতে এগিয়ে আসা লোকটি তাদের নিয়ে ভাবতেন। যখন তাদের ক্লাসে বসে বই পড়ার কথা তখন তারা মাঠে বসে বিড়ি ফুকবে এটা তিনি মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু কিভাবে তাদের লেখাপড়া শেখানো যায়?

অভাবের সংসার, সকালে হাল চাষ, এরপর গরু চরানো, হাটে যাওয়া এসব রেখে তারা পড়তে আসবে? তিনি ভাবলেন, যেভাবেই হোক তাদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। সহজ-সরল লোকটি সকালবেলা বেরিয়ে পড়তেন গ্রামে। হাতে ছাতা, পরনে সাধারণ মানের পোশাক। তিনি প্রতিটি কিশোর, তরুণের কাছে যেতেন। অনেক উপদেশ দিতেন। কিন্তু তা ব্যর্থ হতো। ভাবলেন এভাবে নয়, নতুন কিছু করতে হবে। তাই তিনি কিশোর, তরুণদের কাছে গিয়ে তাদের হাতে ধরিয়ে দিতেন এক মুঠো চানা, মটর অথবা একটা লজেন্স। এতে কাজ না হলে ধরিয়ে দিতেন বিড়ি। এতে কাজ হতো। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো তার প্রতিষ্ঠান। একটি আম গাছের নিচে ছাত্ররা জড়ো হতো। শিক্ষা নিতো। বিনিময়ে পেতো চানা, মটর, চকলেট, বিড়ি। বিড়ি! কেমন অনৈতিক মনে হয়। তাই না? ক্ষতি কি, পড়তে না এলেও তো সে বাবার পকেট চুরি করে, না হয় ধান চুরি করে বিড়ি খেতো। ওই মহান শিক্ষকটি খ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন ছাতার জন্য। সকালে ছাতা হাতে মাঠে কেউ বের হলে ছাত্ররা ভাবতো এই বুঝি শিক্ষক এলেন। আবার গাছের নিচের ক্লাস নেয়ার সময় তিনি ছাতাটা মাথার ওপর রাখতেন। এ যেন ইট-পাথরের তৈরি প্রতিষ্ঠানের চেয়েও দৃঢ় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দাড়িয়ে আছে আপন ভঙ্গিমায়। এ যে আমাদের নছই মাস্টারের স্কুল।

বলদী, সিলেট থেকে

যত্ন

– সুমী নন্দী

অন্যান্য জিনিসের মতো ছাতারও যত্ন নিতে হয়। তবে এ যত্নটা এতো ব্যাপক নয়। ছাতার যত্নে কয়েকটি টিপস দিচ্ছি। পাঠক, টিপসগুলো পড়ে মনে হবে এসব তো আমরাও জানি। কিন্তু জানা থাকা সত্ত্বেও অযত্ন, অবহেলায় ছাতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই জানা টিপসগুলো একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যাক।

বাইরে থেকে আসার পর ভেজা ছাতা যেখানে সেখানে না রেখে খোলা জায়গায় মেলে রাখুন। প্রয়োজনে ছাতাকে রোদে শুকাতে দিন।

দীর্ঘ দিন ছাতা ব্যবহারের প্রয়োজন না পড়লে ছাতাকে অযত্নে ফেলে রাখবেন না। কারণ এতে তেলাপোকা, ইদুর প্রভৃতি পোকায় কেটে ফেলে। তাই সাবধান, ছাতাকে নিরাপদ স্থানে রাখুন। সম্ভব হলে ন্যাপথালিন দিয়ে রাখুন।

ছাতার লোহার শিকের গোড়াগুলোতে অনেক সময় মরিচা পড়ে। এক্ষেত্রে শিকের গোড়ায় দুই এক ফোটা কেরোসিন তেল দিতে পারেন। এতে মরিচা থেকে ছাতা বাচবে, পাশাপাশি কাজও করবে ভালো।

আপনার দামি ছাতাটি ইদুরে কেটে ফেলেছে, চিন্তা কি? ছাতার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ওই সুতা দিয়ে রিফু করুন। দেখবেন আগের মতো নতুন হয়ে গেছে।

বাতাসের বিপরীত দিকে ছাতা ধরবেন না, এতে ছাতা উল্টে গিয়ে ছাতার ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া দমকা বাতাসে ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া দমকা বাতাসে অসাবধানতাবশত হাত থেকে ছাতা উড়েও যেতে পারে। তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

আপনার ছাতার যত্ন নিন। একই ছাতার নিচে দুজনে সুন্দরভাবে পথ চলুন।

সিলেট থেকে

ছাতাওয়ালি

– সৈয়দা নূর আফসা রুমা

এক বর্ষাকালের কথা। তখন স্কুলে পড়ি হাই স্কুলে যাবার সময় আম্মা বলতেন, সঙ্গে করে যেন ছাতা নিয়ে যাই। যেহেতু হাই স্কুলে পড়ি সেহেতু ছাতা নিয়ে যেতে অস্বস্তি লাগতো। সঙ্গে করে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে যেতাম ঠিকই তবে স্কুলে নিয়ে যেতাম না। স্কুলের পাশের এক বাড়িতে ছাতাটি রেখে দিতাম। আসার সময় নিয়ে আসতাম।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত স্কুল বাদ দিতে চায় না। আর কিছু না হোক এতোসব বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করার লোভে হলেও স্কুলে যেতে চায়। ঝুম বৃষ্টি হলে ছাতা নিয়ে বের হতে হতো।

আমাদের ফার্স্টবয় ছিল কয়েস। আমাদের স্কুলে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়তাম। বেশির ভাগ গ্রামের স্কুলে ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে পড়ে। আমাদের ফার্স্টবয় কয়েস পড়ালেখায় যেমন ভালো ছিল তেমনি দুষ্টুমিতেও ছিল এক নাম্বার। আমাদের ক্লাসের প্রতিটি ছেলেমেয়ের একটা করে ছদ্ম নাম সে দিতো। আমাকে ডাকতো ছাতাওয়ালি বলে। তার দেখাদেখি ক্লাসের সবাই আমাকে ছাতাওয়ালি বলতো।

একদিন ক্ষেপে গিয়ে কয়েসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুই আমাকে ছাতাওয়ালি বলিস এর কারণটা কি?

ও হেসে উত্তর দিয়েছিল, ছাতা দিয়ে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ধর, কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবি, এর জন্য একগাদা মেকআপ করেছিস। এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলো, ছাতা না নিয়ে বের হলে বৃষ্টিতে ভিজে এতো সাধের মেকআপ নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া ওই গল্প তো অবশ্যই শুনেছিস? ওই যে, এক মহিলার সামনে বাঘ পড়ে গেল। বাঘটি মহিলাকে খেয়ে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল! মহিলা বুদ্ধি করে হাতের রঙিন ছাতা মেলে ধরায় বাঘটি ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাই *ছাতাওয়ালি* শব্দটা আমার কাছে এতোটা খারাপ মনে হয়নি। অবশ্য তুই যদি বলিস তাহলে তোর নাম ছাতাওয়ালি বদলে অন্য কোনো নাম দিতে পারি।

আগ্রহী হয়ে বলেছিলাম, কি নাম দিবি?

কয়েস হেসে বলেছিল, ছাতিওয়ালি।

সেই বর্ষার একদিনের কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সাধারণত স্কুল ছুটি হয় চারটার দিকে। আকাশের অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ থাকায় সাড়ে তিনটার দিকে ছুটি হয়ে গেল। ছুটি হবার পর পরই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অবশ্য তখন আমরা সবাই স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। বৃষ্টিতে সবাই ভিজে যাচ্ছি। দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলাম একটি

ছেলে বলছে, এই যে আপারা, আপনারা তো ভিজে যাচ্ছেন। বৃষ্টিতে ভিজে আপনাদের শেমিজ আর ব্রা দেখা যাচ্ছে।

খুব তাড়াতাড়ি করে সে দোকানটা পার হয়ে এলাম। আজকে ছাতা আনিনি বলে নিজের ওপর খুব রাগ হলো। রাস্তা দিয়ে ছাতা মাথায় করে কে যেন আসছে। মাথা তুলে দেখতে পেলাম জমসেদভাই আসছেন। তিনি আমার ফুপাতো ভাই হন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়েও পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। মাথায় বৃষ্টি পড়ছে না বুঝে উপরের দিকে তাকালাম। দেখি আমার মাথার ওপর ছাতা রয়েছে। অবাক হয়ে পেছন ফিরে দেখতে পেলাম জমসেদভাই আমার মাথার ওপর ছাতা ধরে আছেন। কিন্তু তিনি ভিজে যাচ্ছেন।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি ভিজে যাচ্ছেন। ছাতার নিচে আসুন।

জমসেদভাই বললেন, সঙ্গে তোমার বান্ধবীরা আছে। এক ছাতার নিচে থাকলে ওরা তো অন্য কিছু মনে করবে।

বললাম, যা মনে করার তা ওরা মনে করে ফেলেছে।

এতো মেয়েদের মাঝে আমার সে কথা শুনে জমসেদভাই হেসেছিলেন।

মৌলভীবাজার থেকে

আষাঢ়ে বর

– রেবা রশীদ

আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। কারো দিকে তাকানোর অবকাশ নেই। দিন যেতে যেতে চলে এলো বর্ষার দিন। আকাশে যখন-তখন মেঘ। বৃষ্টির কোনো সময়সীমা নেই। প্রত্যেক দিন ছাতা নিয়ে যেতাম। কিন্তু তার সঠিক ব্যবহার হতো না।

একদিন সকালবেলা প্রচণ্ড রোদ। তাই ছাতা নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম না কলেজে। ক্লাসের প্রথম দিকেরগুলো ভালোই গেল। কিন্তু ছুটি হওয়ার আধঘণ্টা আগ থেকে শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। কোনোমতে কলেজ থেকে বের হয়ে রিকশার খোজ করছি। কিন্তু কোথাও রিকশা পেলাম না। এমন সময় দেখি সুন্দর একটি স্মার্ট ছেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বললো চলুন, আপনাকে এগিয়ে দেই।

প্রথমে অবশ্য একটু আপত্তি দেখালাম। পরে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর থেকে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হতো। কথা বলতাম। খুব ভালো লাগতো তার সঙ্গে কথা বলতে। তাকে না দেখলে খুব খারাপ লাগতো। নিজের অজান্তেই ভালোবেসে ফেললাম। অবশ্য বলার মতো সাহস হয়নি। একদিন সেই আমাকে বলে ফেললো তার ভালোলাগা, ভালোবাসার কথা। ছাতার অজুহাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হলো। সুতরাং আমাদের প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু হলো ছাতা। মনে মনে প্রতিদিন বৃষ্টি কামনা করতাম।

আস্তে আস্তে ছাতা ব্যবহারের দিন ফুরিয়ে আসতে লাগলো আর আমাদের চুপি চুপি প্রেমের ব্যাপারটাও জনসমুদ্রে প্রকাশিত হতে লাগলো। পরিবারের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি হতে লাগলো। কিন্তু আমার করার কিছুই নেই। আমি সেই ছাতাধারী প্রেমিকের প্রেমে পাগল। সেও অবশ্য আমার জন্য পাগল। খুবই কষ্টে যেতে লাগলো আমাদের দিন। গড়াতে গড়াতে তিনটি বছর পার হলো। ইতিমধ্যে

সে একটি চাকরি পেয়ে গিয়েছে। এবং আমি মোটামুটি অবসর জীবন যাপন করছি। আমাদের প্রেমের অবসান ঘটাতে তার বাবা-মা এলেন আমাদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। ভালো ছেলে বলে আমার পরিবার সহজেই রাজি হয়ে গেল।

বিয়ের তারিখ ঠিক হলো আষাঢ়ের ১৬ তারিখে। বিয়ের দুই দিন আগ থেকেই বৃষ্টি শুরু হলো। বিয়ের দিন বৃষ্টির আরো উন্নতি হলো। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেল। ছাতা মাথায় আষাঢ় মাসে প্রেমিক এলো বর বেশে। আমি ছিলাম কনে সেজে। আমাদের বিয়ের দিনও ছাতা আমাদের সঙ্গ দিয়েছে। ছাতা ছিল বলেই হয়তো বা আমি পেয়েছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বামী।

সৈয়দপুর থেকে

ব্যথা

– মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

গ্রামের বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ফরাজী কান্দি আল আমিন এতিমখানা ও সিনিয়র মাদ্রাসা সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমি তখন ওই স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র। আমার বাবা চট্টগ্রামে চাকরি করতেন। বর্ষাকাল। তাই আমাদের পারিবারিক প্রয়োজনে চট্টগ্রাম থেকে একটি ছাতা কিনে আনেন। পরের দিন স্কুলে যাওয়ার পথে প্যাকেট থেকে খুলে সেই নতুন ছাতাটি মাথায় দিয়ে মনের খুশিতে স্কুলে গেলাম। নতুন ছাতা দেখে সহপাঠীদের মধ্যে বেশ কৌতূহল। অনেকেই ছাতাটি মাথায় দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে এলো। এমন সময় আমাদের প্রধান শিক্ষক কোথাও যাবেন। বাইরে বৃষ্টি। তাই আমার কাছ থেকে ছাতাটি চেয়ে নিলেন। আমিও প্রধান শিক্ষককে ছাতা দিয়ে সাহায্য করতে পারায় পুলকিত। ক্লাসের ব্যস্ততায় ছাতার কথা আর মনে ছিল না। প্রধান শিক্ষকও অজ্ঞাত কারণে ছাতা ফেরত দিতে আসেননি।

স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে বৃষ্টি ছিল না। তাই তখনো ছাতার কথা মনে পড়েনি। সহপাঠীদের সঙ্গে হাসি আনন্দে বাড়ি ফিরে আসি। বাড়িতেও কারোরই ছাতার প্রয়োজন পড়েনি। তাই কেউ খোজও করেনি। পরের দিন স্কুলে হঠাৎ বৃষ্টি দেখে ছাতার কথা মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে গিয়ে ছাতার খোজ করলে প্রধান শিক্ষক সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন, গতকালই তো তোমাকে ছাতা ফেরত দিয়েছি।

তখনকার মানসিক অবস্থায় কখন দিলেন? কোথায় দিলেন? কার সামনে কি অবস্থায় দিলেন? কিছুই প্রশ্ন করার সাহস হয়নি।

সম্পূর্ণ নতুন ছাতাটির জন্য খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। কয়েকদিন পর বাড়িতে ছাতাটির তলব হলে মায়ের পিটুনির ভয়ে ছাতা সম্পর্কে যেন কিছুই জানি না এমন ভান করি।

আজ প্রায় চব্বিশ বছর পার হয়েছে। প্রসঙ্গ এলেই প্রধান শিক্ষকের হাতে নিজ হাতে ছাতাটি তুলে দেয়ার দৃশ্যটি এখনো চোখে ভাসে।

চাদপুর থেকে

ঠেস

– দিদার

১৯৯৩ সালের ঘটনা। গ্রামের স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে সবেমাত্র মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারি হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়েছি। আমি ছিলাম বিজ্ঞান বিভাগের আর যাকে নিয়ে ঘটনা তার নাম তানিয়া। সে মানবিকের ছাত্রী। আমি নতুন বলে কারো সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। কিন্তু মুখচেনা অনেকেকেই চিনতাম। তানিয়াকেও সেভাবে চিনতাম এবং জানতাম সে মানবিকের ছাত্রী। সে আমাকে চিনতো না। আমি অন্যদের চেয়ে একটু খাটো ছিলাম এবং তানিয়া ছিল লম্বাটে ধরনের। একদিন যখন স্কুল ছুটি হয়েছে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। ছাতা ছাড়া বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। যাদের ছিল তারা চলে গেছে। বাকি সবাই স্কুলের বারান্দায় দাড়ানো। খানিক পরেই বাসা থেকে আমার জন্য ছাতা এলো।

আমি ছাতা মেলে বারান্দা থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই শুনলাম, *এই ছেরা, আমারে লইয়্যা যা। একটু রিকশাতে তুইল্যা দে।*

আমি তো অবাক। মনে মনে বলি, পাগলি কয় কি? অবশ্য তখন মনে হয়েছিল একটা মেয়ে ছাতা মাথায় আমার সঙ্গে যাবে। তাই কেমন যেন শিরশির লাগছিল। আমি দুই পা পেছনে আসতেই সে এক লাফে ছাতার নিচে ঢুকে পড়লো। সে বাম পাশে এবং তার একটা হাত আমার ডান কাধে রেখে শরীর ঘেষে চলছিল যাতে না ভেজে। আর দুটি কোমর পদে পদেই ঠেস লাগছিল।

তখন হাটতে হাটতে মনে মনে বলছিলাম, *ছেরিরে, তুইতো জানস না তোর সঙ্গে আমি পড়ি।*

সে হয়তো মনে করেছিল আমি ছোট ক্লাসেই পড়ি। তাকে রিকশায় তুলে দিলাম এবং সে চলে গেল। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইলাম এবং মনে মনে হাসছিলাম তার না চেনার বোকামি দেখে। যদি চিনতো তাহলে হয়তো আমার সঙ্গে যেতো না এবং গেলেও এভাবে কোমরে ঠেস লাগতো না। অবশ্য এই উপকারের জন্য সে ছোটভাই মনে করেও একটু কৃতজ্ঞতা জানায়নি। পক্ষান্তরে আমিও তা আশা করিনি। শুধু মনে মনে হাসছিলাম কোমরে ঠেস লাগার দৃশ্যটা নিয়ে। তারপর বাসায় চলে গেলাম।

কিছুদিন পর জানতে পারলাম, তানিয়াকে আমার এক বন্ধু ভালোবাসে। অবশ্য এখনো ভালোবাসে কি না জানি না। তাই তাকে যখনই এক ছাতার নিচে কোমরে ঠেস-এর কথা অর্থাৎ তার প্রিয়াকে নিয়ে ঘটনাটা বলি তখন সে খুব রেগে যায়। আমরা সবাই তাকে নিয়ে আমোদ করি। ঘটনাটা তানিয়াকে এখনো বলা হয়নি। কারণ তার সঙ্গে আমি ফৃ নই। সে এখন ইডেন কলেজে পড়ে।

ময়মনসিংহ থেকে

অসামান্য

– এএসএম ফয়সল বিন আলম

১৯৯৮ সালে আমি প্রাথমিক বৃত্তি পাই। বৃত্তি পাওয়াতে আমাকে অনেকে অনেক কিছু গিফট দেয়। আমার নানাভাই একটা ছাতা উপহার দিয়েছিলেন। ছাতাটা দেয়ার সময় নানাভাই বলেছিলেন, ছাতা যেমন রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে তেমনি তোমাকে মেধা, মনন, প্রজ্ঞা দিয়ে তোমার পরিবার, সমাজকে রক্ষা করতে হবে। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। কারণ তুমি তোমার বাবা মায়ের

একমাত্র সন্তান। ছাতা তো শুধু রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু তোমার কাছে আমরা অনেক প্রত্যাশা করি। এছাড়া আরো অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন।

ছাতাটা দেখলেই নানাভাইয়ের উপদেশগুলো আমার কানে বাজতো। ছাতাটাও আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। থৃ ফোল্ডিং ছাতা। পকেটে রাখা যেতো। ভেতরে শাদা আর ওপরে নেভি ব্লু। আমার পছন্দের রঙ।

ছাতাটা খুব কম ব্যবহার করতাম যাতে সহজে নষ্ট না হয়। ছাতাটা ছিল আমার বন্ধুর মতো। মাঝে মাঝে শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করতাম, সেন্ট মাখাতাম। ছাতা নিয়ে বাড়াবাড়ির জন্য আম্মু বকাও দিতেন।

একদিন স্কুল থেকে এসে দেখি আমার প্রিয় ছাতাটা নেই। আম্মুর কাছ থেকে জানতে পারলাম, আমাদের এক আত্মীয় বেড়াতে এসে বৃষ্টির কারণে যেতে পারছিল না। তাই ছাতাটা নিয়ে গিয়েছে। আম্মু জানালেন দুই একদিনের মধ্যে দিয়ে যাবে।

আমার মনটা খুব খারাপ হলো। আব্বুর ওপর খুব রাগও হলো। আজ প্রায় এক বছর হতে চললো আমার ছাতাটা এখনো ফেরত দেয়নি। আব্বুকে বললে বলেন, সামান্য ছাতা আর চাওয়ার দরকার নেই।

ছাতাটা সবার কাছে সামান্য হলেও আমার কাছে ছিল অসামান্য। ছাতাটার কথা মনে হলে এখনো মনটা আমার অন্য রকম হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে এক ফোটা পানি গড়িয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়া থেকে

অব্যক্ত

– এমএস আলম

তখন আমি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। স্কুল জীবনে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। একই স্কুলে পড়তাম। আবার একই কলেজে পড়ছি। প্রতিদিন ক্লাস করতাম শুধুই তার জন্য। কয়েকদিন যাবৎ প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। সময় মতো ক্লাস করতে পারছি না। এ মুহূর্তে আমার একটা ছাতার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কে কিনে দেবে আমাকে ছাতা? আমার বড়ভাইকে বললাম একটি ছাতা কিনে দেয়ার জন্য। তিনি রাগ করলেন ছাতা কেনার কথা শুনে। বললেন, লেখাপড়া ঠিক মতো করো না। সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়াও। আবার ছাতা কিনতে চাচ্ছো? কোনো ছাতার প্রয়োজন নেই। ভিজে ভিজেই কলেজে যেও।

আমার কিছুই করার ছিল না। কারণ বড়ভাই ছিল আমার একমাত্র ভরসা।

মায়ের দেয়া কিছু টাকা ছিল আমার কাছে। সেটা দিয়েই ছাতা কিনলাম। বড়ভাইকে সেই ছাতা দেখালাম না। কিন্তু যেদিন ছাতা কিনলাম সেদিন থেকে আর বৃষ্টি নেই। বৃষ্টির ওপর আমার খুব রাগ হলো। কারণ আমার খুব ইচ্ছা ছিল, এতো কষ্টের টাকা দিয়ে কেনা ছাতা নিয়ে কলেজে যাবো এবং আমার বান্ধবীকে দেখাবো নতুন ছাতা। আমি আরো স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। দুজনে একই ছাতার নিচে যাবো এবং মনে মনে বলবো, *বৃষ্টি রে বৃষ্টি আয় না জোরে, ফিরে যাবো না আর যে ঘরে।* আমার স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল। বৃষ্টি হচ্ছে না। তবুও ছাতা নিয়ে কলেজে যেতাম।

হঠাৎ একদিন বৃষ্টি নামলো। ভাবলাম আজ বুঝি স্বপ্ন সত্যি হবে। আমার মনের মানুষটির কাছে গেলাম এবং বললাম, চলো যাই।

সে বললো, তোমার নতুন ছাতাটা দেবে? আমরা দুই বান্ধবী মিলে যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটা দিয়ে দিলাম আর মনে মনে রাগ করতে লাগলাম তার বান্ধবীর ওপর।

পরের দিন সকালে সে কলেজে এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। না, ধন্যবাদ জানাতে নয়, এসেছে ক্ষমা চাইতে।

সে বললো, আলম, তোমাকে যে কি করে বলি।

কি হয়েছে বলো?

তোমার ছাতাটা আমি ভেঙে ফেলেছি।

আমার রাগ তখন আরো বেড়ে গেল। কিছুই বলতে পারিনি তাকে। শুধু বললাম, তাতে কি হয়েছে।

নৌবাহিনী জাহাজ নির্ভয়, চট্টগ্রাম থেকে

কুকুর

– আনিছ

তখন এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ভোর সাড়ে পাচটা হবে আনুমানিক। বাবা ডিউটিতে যাবেন। এদিকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। বাবাকে ছাতা নিয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরছি। সামনে দেখি একটা কুকুর। এমন কুকুর প্রতিদিনই কতো দেখি।

আমি আমার ভাবেই চলছি। হঠাৎ কুকুরটি আমাকে অতিক্রম না করে সোজা আমার উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসলো। আমি কি করবো স্থির করতে পারছি না তখন। হঠাৎ কি মনে করে মাথার ওপর থাকা ছাতাটি আমার সামনে মেলে ধরলাম। ওই কুকুর আরো দ্বিগুণ আক্রোশ নিয়ে আমার ওপর অর্থাৎ ছাতার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। কুকুরের বিষাক্ত দাতের কামড়ে আমার প্রিয় ছাতাটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। ছাতার জন্য মনে আফসোস হলেও যখন ভাবি, এ ছাতাই আমাকে কুকুরের কামড় থেকে রক্ষা করেছে তখন আর সেই আফসোস বোধটা থাকে না। কারণ পরে ওই কুকুরটি আরো দশ বারোজনকে কামড়িয়ে ছিল।

ওই দিন উপস্থিত বুদ্ধি আর ছাতার জন্যই একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে বেচে গিয়েছিলাম।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

মিষ্টি হাসি

– মোহাম্মদ মফিজুর রশিদ

ছাতা নামে দুই অক্ষরের শব্দটি সব সময়ই আমার কাছে বিরক্তিকর। ছাতা সঙ্গে করে চলা একেবারেই অস্বস্তিকর। তাই পারতপক্ষে ছাতাকে সঙ্গী করতাম না। যদি কখনো প্রাকৃতিক কারণে ছাতাকে সঙ্গী করতাম তাহলে প্রায়ই হারিয়ে ফেলতাম। ফলে মা-বাবার বকা শুনতে হতো। পরবর্তী কালে অর্ধাঙ্গিনীর তিরস্কার যা সত্যিই মধুর। ছাতা নিয়ে আমার জীবনের একটা মধুর ঘটনা ঘটে সুইডেনে।

জার্মান সরকারের খরচে উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য জার্মানি যাই। এখানে সব সময় ব্যাগে ছাতা রাখতে হতো, না হলে যে কোনো সময় বৃষ্টিতে ভিজতে হতো। এখানকার প্রকৃতি মেয়েদের চোখের মতো বলা নেই, কওয়া নেই অঝোরে ঝরতে শুরু করে।

সুইডেনে বেশ কয়েকদিন বেড়ানোর পর আবার যখন জার্মানি–তে আসি তখন বিভিন্নজনের কাছে থেকে নানান ধরনের উপহার পাই। এর ভেতর আমার বেয়াই (ভায়রার ছোটভাই) যে কম্পানিতে চাকরি করে সেই কম্পানির কারখানার একটা শাদা–নীল রঙের বড় ছাতা দিল। তখন সেটা না পারি রাখতে, না পারি আনতে। হাতে করে আনতে লজ্জা পাচ্ছিলাম।

সঙ্গে ছিল বড় সুটকেস, ছাতার স্টিলের অংশ বাকা করে কোনো রকমে সুটকেসে ঢোকালাম।

আত্মীয়স্বজন রেখে চলে আসছিলাম, বিশেষ করে ভাই ও ভায়রার ছেলেমেয়েদেরকে রেখে। তাই মনটা খারাপ লাগছিল।

যখন এয়ারপোর্ট এলাম তখন দেখি প্রায় সকলের হাতেই ছাতা যা আমার সুটকেসের ভেতরে। যখন লুফথানসা–র প্লেনে উঠছি তখন দেখি সকলের হাতেই আমার ছাতার মতো একটা করে ছাতা। কারো হাতে একের অধিক ছাতা। নিজের কাছে নিজেকে সঙ্কীর্ণ মনে হলো। তখন থেকেই এ ছাতার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করলাম।

একইভাবে ছাতাটাকে বাসায় নিয়ে এলাম। ছাতা দেখে গিন্নি বললো, এতো সুন্দর ছাতা।

তখন তাকে বললাম, এটা তোমার বেয়াই–এর দেয়া। এজন্য এতো সুন্দর। এখন সেই ছাতাটার প্রতিই আমার দুর্বলতা বেশি। একবার হারিয়েছিল। মনটা ভীষণ খারাপ হয়েছিল। কিন্তু দৈবক্রমে ছাতাটা আবার পেয়ে যাই। ছাতাটার যত্ন আমি নিই।

মজার বিষয় হলো, যখনই ছাতাটার প্রতি নজর যায় তখনই আগের স্মৃতি মনে পড়ে আর হাসি। মাঝে মধ্যে গিন্নির সামনে পড়ে গেলে টিপ্পনি খেতে হয়। কি, আগের কোনো রোমান্টিক স্মৃতি মনে পড়লো নাকি?

উত্তরটাও একই রকম হাসির মাধ্যমে দিই।

ভোলা থেকে

মা ও ছেলে

– উম্মে হাবিবা

কিছুক্ষণ পর পর অঝোর ধারায় বৃষ্টি আবার ঝলমলে রোদ। এ যেন রোদ আর বৃষ্টির খেলা। এমন দিনে লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজে যাচ্ছি অনার্স ক্লাস করতে। যাতায়াতের মাধ্যম ছিল বাস। লোকাল বাস হওয়াতে স্বাভাবিক নিয়মেই যাত্রী উঠছে–নামছে। বাস যখন দালালবাজার এলো তখন বৃষ্টির কারণে ছাতা মাথায় অনেক লোক দেখতে পেলাম। কে কার আগে ছাতা বন্ধ করে বাসে উঠবে তারই প্রতিযোগিতা।

এক ভদ্রমহিলা কোলে তার শিশু এবং অন্য হাতে ছাতা ধরা। সঙ্গে আট–নয় বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে দ্রুত হেটে এলেন। মা ছেলেটির হাতে ছাতাটি দিলেন বন্ধ করতে। বাসের কন্ডাক্টর ভদ্রমহিলাটিকে অনেকটা টেনে বাসে তুলে নিল। এদিকে ছেলেটি কিছুতেই ছাতা বন্ধ করতে পারছে না। বাস ছেড়ে দেয়াতে ছেলেটি ছাতাসহ বাসে উঠতে গেলে কন্ডাক্টর ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিল।

ভদ্রমহিলাটি পুরুষের ভিড়ে দাড়িয়ে কোনো রকমে শুধু বলতে পারলো আমার ছেলে? ততোক্ষণে বাস ছেলেটির থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে।
পেছনে তাকিয়ে দেখি ছেলেটি এতোক্ষণে ছাতা বন্ধ করতে পেরেছে। বৃষ্টিতে যে ভিজছে সে কোনো খেয়াল তার নেই। সে করুণ দৃষ্টিতে চলে আসা বাসের দিকে তাকিয়ে আছে। ইচ্ছা করলে কন্ডাক্টর ছেলেটিকে সাহায্য করতে পারতো কিংবা ভদ্রমহিলাটি তার অধিকার আদায় করে নিতে পারতো। কিন্তু আজো আমাদের দেশে ভদ্রমহিলারা যেমন পুরুষের মাঝে বড় অসহায় তেমনি শিশুরাও হয় চরমভাবে অবহেলিত।

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে

হাওয়া

– মোহাম্মদ আনিছুর রহমান

ছাতা। দুই অক্ষরের একটি জিনিস। যে জিনিস আমাদের রোদ এবং বৃষ্টির হাত থেকে বাচায়। এই ছাতা নিয়ে একটি স্মৃতির কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমি কখনো কারো খপ্পরে পড়ে কোনো কিছু হারাইনি। কিন্তু ছাতা হারাতে হয়েছিল। আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। একটি ছোট ছাতা নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেটে আসছিলাম। হঠাৎ এক লোক আমার ছাতার নিচে এসে বললো, আমাকে একটু সামনের বিল্ডিংটায় পৌছে দেবেন?
যাই হোক। তাকে নিয়ে বিল্ডিংটার সামনে এলাম।
সে বললো, তুমি দাড়াও, আমি বাসা থেকে আসছি।
ছাতা নিয়ে সেই যে গেল আর এলো না। বিল্ডিংটার প্রতিটি বাড়ি গিয়ে খুজেছিলাম। কিন্তু পাইনি। বাসায় এসে যখন বললাম তখন মা আমাকে যে বকা দিলেন তা সারা জীবন মনে থাকবে। আজও ছাতা দেখলে আমার সেই ধোলাইয়ের কথা মনে পড়ে। কিন্তু একটা জিনিস কোনোদিনই বুঝিনি। সেই মানুষটা কিভাবে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল?

চট্টগ্রাম থেকে

মাশুল

-- জাহীদ

রোদ ঝলমলে মেঘহীন সকাল। মেজাজ ফুরফুরে। আজ প্রিয়ার সঙ্গে ডেট। সকালে সেরা পোশাকে সেজে বিসমিল্লাহ বলে বাড়ি থেকে বের হলাম। নির্দিষ্ট স্থানে এসে চারটা সিগারেট, বেশ কয়েকদানা এলাচি এবং চকলেট খেলাম যাতে মুখে তামাকের গন্ধ না থাকে। এমনকি কয়েকবার বডি স্প্রে করলাম শরীরে যাতে গন্ধ না থাকে।
প্রায় চল্লিশ মিনিট, যা আমার কাছে ছিল এক বছর, তারপর আমার পাগলি তশরিফ রাখলেন। ছেলেদের অভিমান মানায় না জানতাম। তাই কিছু বললাম না। আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা করে প্রায় দুই ঘণ্টা পার হলো। হঠাৎ দেখলাম, আকাশটা কেমন জানি করছে। মিষ্টি রোদকে বিদায় করে কালো মেঘ জায়গা করে নিচ্ছে। একবার ভাবলাম চলে যাই। কিন্তু একটু একটু করতে যাওয়া হচ্ছে না। অল্প

বাতাস, টিপ টিপ থেকে মুষলধারে বৃষ্টির বেইমানি শুরু হলো। এতো সুন্দর সকাল কোন গাধায় ছাতা আনে! তবে আমার সাবধানী প্রেয়সী অতিরিক্ত সাবধানে তার কলেজ ব্যাগ ক্লাস রুমে রেখে এসেছে যার মধ্যে ছাতা ছিল।
কোনো শুটিং নয়। মুভি ক্যামেরা নেই। তারপরও দুইজনে বৃষ্টিতে ভিজছি। এখন সমস্যা হলো বাসায় গিয়ে সে বলবে কি? ছাতা সঙ্গে থাকতে ভিজলো কিভাবে? অবশেষে বৃষ্টির লাল কার্ড খেতে হলো। বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। কলেজে প্রবেশ। বান্ধবীরা সকলে জানে। দেখে কিছু বললো না।
তবে বৃষ্টি আর ছাতা দুইজনে মিলে একটা কাজ করেছে। এদিন থেকে আমরা দুজনে প্রায় দশ দিন বিছানায় ছিলাম। সে তার বাড়িতে আর আমি আমার বাড়িতে জ্বরে ভুগেছি।

ফুলতলা, খুলনা থেকে

আশ্রয়

– প্রেমা

১৯৮৯ সাল জুন–জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়। প্রায় প্রতিদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামছে। তার মাঝেই স্কুলে গেলাম। এ ঘটনার দুই তিন মাস আগে থেকেই আমাদের স্কুলের একটা ছেলে আমার দিকে শুধু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। খুব রাগ হতো। সেদিন স্কুলে ছুটির পর নামলো বৃষ্টি। বাসা থেকে বুয়া ছাতা নিয়ে এসেছে। ছাতা নিয়ে নামলাম রাস্তায়। হঠাৎ সেই ছেলেটি আমার ছাতার মধ্যে ঢুকলো। রাগে জ্বলে উঠলাম। বললাম, এটা কি আপনার ছাতা? আমার ছাতার নিচে কেন এসেছেন?
বলার সঙ্গেই সঙ্গে ছেলেটা হেসে বের হয়ে গেল।
সোজা বাড়ি চলে এলাম।
আজ শুধু ছাতা কেন, স্বয়ং আমি তার হয়ে গেছি। সেদিন ছাতার নিচে তাকে আশ্রয় দেইনি ঠিকই কিন্তু আজ মনের অন্তরস্থলে তাকে দিয়েছি আশ্রয়। তাই যখন বৃষ্টি দেখি, মনে পড়ে যায় সেদিনের ছাতার ঘটনাটা।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, বাসাবো থেকে

চেনা চেনা

– পুনম

কলেজ ছুটি হয় একটা থেকে একটা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু বাড়িতে পৌছাই তিনটার দিকে। মাঝের সময়টা কাটে আড্ডা দিয়েই। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে আট নয়জন বন্ধু। কিন্তু আড্ডার সময় আর কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলে মনে হয় না। ছেলেগুলো প্রায়ই আমাদের ব্যাগ থেকে টাকা, কলম, সানগ্লাস ইত্যাদি জোর করে নিয়ে যায় এবং বলে টাকা খরচ হয়ে গেছে, কলম হারিয়ে গেছে। পুরনো হয়ে গেলে সানগ্লাস ফেরত দেবো ইত্যাদি।
একদিন ঠিক হলো আমরাও কিছু একটা নেবো। কিন্তু কি এবং কিভাবে। একদিন সেই সুযোগ এসে গেল। সাইম সেদিন ছাতা নিয়ে এসেছিল আর রোদের কারণে ছাতাটা আমার হাতেই ছিল। আমরা

তিন বান্ধবী রিকশায় উঠলাম। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কিন্তু ছাতা ফেরত নিতে সাইম ভুলে গেল। মাঝপথে আমরা প্ল্যান করলাম ছাতাটা নিয়ে তাদের অনেক দিন ভোগাবো। যেমন কথা তেমন কাজ। পরের দিন নয়ন এলো এবং ছাতাটি চাইলো।

বললাম, আমার কাছে ছাতা নেই। সালমাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কিছু বলতে পারলো না।

তারা তখন শিমুর বাসায় গেল। শিমু বললো, ছাতা মনে হয় শামীমার কাছে।

তারপর শামীমার বাসা। শামীমা বললো, হয়তো পুনমের কাছে।

এতে সাইম বুঝতে পারলো আমরা তাদের ঘোরাচ্ছি এবং ফাইনালি সন্দেহ করলো শিমুকে। এরপরের দিন শামীমার নিয়ে আসা ছাতাটা কেড়ে নিল। আমরা ভীষণ টেনশনে পড়লাম এবং নয়নকে ডেকে বললাম, ছাতাটা আসলে রিকশা থেকেই হারিয়ে গেছে। রিকশা থেকে নামার সময় তা সিটে রেখেই নেমে পড়েছিলাম। আমার মিথ্যা বলার আর্ট দেখে নিজেই মুগ্ধ হলাম এবং তারা এটা বিশ্বাস করাতে শামীমার ছাতা উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম।

সাইম খুব টেনশন করছে বাসায় গিয়ে কি বলবে তা চিন্তা করে।

আমরা তাদের সান্ত্বনা দিলাম, সরি বললাম এবং নতুন ছাতা কেনার কথা বললাম। এ কথাটিই যেন কাল হলো। জেমস বললো, শিমুকে অথবা শামীমাকে ছাতা কিনে দিতে হবে। আমাকে কেউ দোষারোপ করলো না। সবাই ঠিক করলো কিছুদিন পর কিনে দেবে ছাতা।

এর বেশ কিছুদিন পর ছাতাটা কলেজে নিয়ে সাইমকে দিয়ে বললাম, এটা এতোদিন আমার কাছেই ছিল। কিন্তু আমাকেই কেউ সন্দেহ করেনি। অন্যের জিনিস নিলে কেমন লাগে তা তারা বুঝলো। কিন্তু শোধরালো না। এমনকি এখনো সুযোগ পেলে ব্যাগ থেকে টাকা, কলম নিয়ে যায়। এতে আমরা ঝগড়া করি আবার মিল হয়।

অনেক দিন কেটে গেছে। আমরা একেকজন একেক দিকে। এরপর আড্ডায় কারো হাতে ছাতা দেখলে সেই সব কথা মনে করি আর বলে ফেলি, *ছাতাটা চেনা চেনা লাগে।*

ময়মনসিংহ থেকে

রেইনি ডে

-- মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক শাহিন

বাবা ছিলেন কৃষক মানুষ। কয়েকটি মাথালের সঙ্গে একটি ছাতা ছিল সম্ভবত রেলি ১০০০। ছাতাটির বয়স কতো হবে তা বের করার উপায় ছিল না। কেননা তালির ওপর তালি পড়ায় ছাতাটির আসল চেহারা চাপা পড়েছিল।

মাঠে বাবার জন্য জলপান নেয়ার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছাতাটিকে নিতে হলো। ঝম ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ছাতাটিতে পট্টি থাকায় বর্ষার জলে শুষে এতোই ভারী হলো যে ঝড়ের সময় এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলাম না। এক সময় সেটি উল্টে গেল। বকা খাওয়ার ভয়ে সোজা করতে গিয়ে কয়েকটি শিখ গেল ভেঙে। ভিজে চুপসে বাবার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। ভাবছি ছাতার বাড়ি এই বুঝি পাছায় পড়লো। না, বাবা কিছুই বললেন না। তার ভিজে গামছাটা চিপে জল ছাড়িয়ে আমার মাথা মুছে দিলেন। আমার চোখে জল চলে এলো।

মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে। বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। স্কুলে যাওয়া আমার চাই চাই-ই। মা বললেন, মাথাল নিয়ে যা।

ভীষণ রাগ হলো মায়ের ওপর। মাথাল নিয়ে কেউ কি স্কুলে যায়? এমন ইতিহাস কি বাংলাদেশে আছে? আমার কিশোর মন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কেন আমাদের একটা জল ছাতা নেই? কালো ছাতা, শাদা ছাতা, রঙিন ছাতা, সবুজ ছাতা কতোই না বাহারি ছাতা। কিন্তু আমাদের নেই কেন?

ঝুড়ি রাখার কাজে ব্যবহৃত ইউরিয়া সারের ভেতরের খোলটা (পলিথিন) আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন মা। চোখ বরাবর দুটো ফুটো করে পরে নিলাম খোলটি। স্কুলে গিয়ে দেখি কেউ আসেনি। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করি স্কুল বারান্দায়। কেউ এলো না। বাড়ি ফিরে এলাম। পরের দিন স্কুলে গিয়ে জানলাম হেড স্যার গতকালকে রেইনি ডে ঘোষণা করেছেন। আমার মুখে তৃপ্তির হাসি। স্কুলে উপস্থিতির রেকর্ডটি আমার দখলে রয়েছে।

আমার বড়ছেলে শাওন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্র। আমার কর্মস্থল থেকে স্কুলের দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার। জুট মিলের গাড়িতে একা যায়। স্কুল ছুটি হলে আমি গিয়ে নিয়ে আসি। সেদিন স্কুলে গিয়ে দেখি কোনো ছাত্র নেই। ভীষণ ভয় পেলাম। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় ছাত্র-শিক্ষকের উপস্থিতি নিতান্তই কম হওয়ায় ক্লাস রুম পর্যন্ত খোলা হয়নি। রেইনি ডে। ভাবলাম একাল ও সেকালের রেইনি ডে-র মধ্যে কতো পার্থক্য।

শাওনকে পেয়ে চিন্তামুক্ত হলাম।

আব্বু, রাতুলের মতো বাশিওয়ালা ছাতা আজই কিনে দিতে হবে।

আরডি মার্কেট থেকে ৬০ টাকায় একটা বেবি ছাতা কিনে টেম্পো ধরার জন্য রওনা হলাম।

রাজশাহী থেকে

জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী

– মোহাম্মদ ওয়ালিদ পাশা নাহিদ

প্রায় পাচ বছর হলো আমার ছোটমামা সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে আসা একটি ছাতা উপহার দেন। ছাতাটি ছিল এক ঘর শাদা, তার পরেরটি সবুজ। এ রকম পুনরাবৃত্তি। সবুজ থাকায় আমার গ্রামের তথা শহরেরও অনেকেই আমাকে সবুজ ছাতা বহনকারী স্বাস্থ্যকর্মী মনে করে। প্রায় সকল পুরুষ ও মহিলা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যখন আমি রোদ কিংবা বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দিয়ে যাই।

কয়েকদিন বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা আলাদাভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়ার উপযুক্ত সময় কখন?

আমি তখন বিজ্ঞানে মাস্টার্স পাস করা জ্ঞানে যতোটুকু জানি সে রকম উত্তর দিই। উত্তর পেয়ে প্রায় সবাই খুশি হয়। কিন্তু যখন ওই সকল জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী দ্রব্য আমার কাছে চায় তখন দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দুঃখ পায়। তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, আমি প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর্মী কি না। আমাকে এ রকম স্বাস্থ্যকর্মী ভাবার অন্যতম কারণ হলো, আমার প্রিয় শাদা-সবুজ ছাতা। অনেকেই আমার ছাতাকে *জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী ছাতা* বলে আখ্যায়িত করে।

শিবালয়, মানিকগঞ্জ থেকে

প্রেসকৃপশন

– মিল্টন রোজারিও

নিঃসন্তান এক লোক ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। জানতে চান কিভাবে বাবা হওয়া যায়। ডাক্তার তখন এক শিকারির গল্প বলতে শুরু করলেন।

শিকারি একদিন বনে শিকার করতে গেছে। ভুলক্রমে বন্দুকের বদলে ছাতা নিয়েছে। হঠাৎ একটা বাঘ সামনে এসে পড়লো। শিকারি অভ্যাসবশত ছাতাকে বন্দুক ভেবে গুলি করলো। আশ্চর্য ব্যাপার, গুলি খেয়ে বাঘটা মারা গেল। এটা কি সম্ভব? ডাক্তার প্রশ্ন করলেন রোগীকে।

রোগী উত্তর দিল ,না।

ডাক্তার তখন বললেন, নিশ্চয় অন্য কেউ গুলি করেছিল। শিকারির ঘাড়ে বন্দুক রেখে অন্য কেউ গুলিটা করেছিল। ডাক্তার গল্প শেষ করে বললেন, বাড়ি ফিরে এই গল্প থেকে সমাধান খুজে নেবেন। তাই বলি খেয়াল রাখবেন যেন কেউ ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি করতে না পারে।

পূর্ব মহিষবাথান, রাজশাহী থেকে